রাতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

দি কলিকাতা ট্রেডিং কোং
প্রিণ্টার্স
৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোণ — কলিকাতা, ৩৬০১

প্রকাশক — শ্রীঅনিলকুমার দে
দি কলিকাতা ট্রেডিং কোং
৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

রাতের ফুল

প্রথম সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৩৪২

এক টাকা

দি কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানীর
প্রিণ্টিং প্রেস হইতে শ্রীবিনয় দত্ত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

আমার এই 'রাতের ফুল' পুস্তকখানি অন্তরের স্নেহ-নিদর্শন স্বরূপ 'বাণী' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কাশী 'আরতি-সাহিত্য-সম্মিলনী'র সাহিত্যিকবৃন্দের হস্তে অর্পিত হইল।

১লা বৈশাখ, ১৩৪২
৩৬-৫৫, অগস্ত্যকুণ্ডু
৺কাশীধাম

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

রাতের ফুল

পবিত্রর কথা

বাস্তবিক—এ যেন এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! রজনীর প্রতি আমার এই যে ভালবাসা—এ প্রেম, আসক্তি না মোহ?

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্যোতিষদা' বলেন, শেষেরটাই না কি ঠিক অর্থাৎ মোহ!

কিন্তু তাই কি?

মোহ কি মানুষের মনে এমন স্থায়ীভাবে......

নিতান্ত অল্পদিন তো নয়, দিনের পর দিন ক'রে ছ'-সাত মাস হ'য়ে গেল, রজনীর প্রতি আমার আকর্ষণ এখনো এতটুকু শিথিল হয় নি কেন?

তার রূপে, শিক্ষায়, হাব-ভাব-ভঙ্গীতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা' আমার মতো একজন উচ্চ-শিক্ষাভিমানী, গর্ব্বিত, চপলচিত্ত যুবককে এই দীর্ঘকাল সমানভাবে মুগ্ধ, মোহাবিষ্ট ক'রে রাখ্তে পারে।

রাঁতের ফুল

এ যদি মোহ হয়, ভালবাসা তবে কি?

সে দিন জ্যোতিষদা'র বাসায় এই নিয়ে খুব খানিকটা বচসা হ'য়ে গেল।

দু'জনেই সমান তার্কিক, হার মানতে কেউ চায় না। অবশ্য আমার দিক্‌টাই কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল, তা' স্বীকার করি, তবু সেই দুর্ব্বলতা-টুকু ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যেই আমি গলার জোরে, মুখের তোড়ে তর্কটা পুরোদমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম। আরো কতদুর চল্‌ত কি জানি, যদি বউদি'—জ্যোতিষদা'র অর্দ্ধাঙ্গিনী না এসে পড়তেন।

—তোমাদের আজ হ'চ্ছে কি বলো দেখি? সেই থেকে শুন্‌ছি রান্নাঘর থেকে—

বউদি' আমাদের উত্তেজিত মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন—মুখ-চোখ একেবারে লাল হ'য়ে গেছে! বাবা রে বাবা! এ কি অনাসৃষ্টি তর্ক?

জ্যোতিষদা' বল্‌লেন — অনাসৃষ্টিই বটে। তুমি এতক্ষণ নেপথ্যে না থেকে সাম্‌নে আস্‌তে যদি, তা'হলে হয়তো আমাদের এ ভোগান্তিক……

তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে আমি বল্‌লুম—ঠিক্ কথা! আচ্ছা আপনিই এর মীমাংসা করুন বউদি', জ্যোতিষদা' তো আমাকে একেবারে উড়িয়েই দিতে চান।

—আমি এ সবের কি বুঝি ভাই? মূর্খ মেয়েমানুষ—

—ও কথা ব'লো না শুভা! এ সব অনাসৃষ্টি বিষয় মেয়েরাই ভাল বুঝবে।

রাতের ফুল

—হ্যাঁ বউদি', আপনি নেপথ্যে সব শুনেছেন তো? আচ্ছা বলুন দেখি······

—র'সো ভাই, আমি এখন কিছু বল্‌ব না। আগে এক কাপ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নাও, সেই কখন্ থেকে বকাবকি করছ, আর এই মাংসের সিঙ্গাড়া ক'খানা গরম গরম ··· ··· দেখ তো কেমন হয়েছে—

বাস্তবিক—গলা না শুকোলেও তর্কের ঝোঁকে ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল বিলক্ষণ, তাই বিনা প্রতিবাদে বউদি'র আদেশ পালন ক'রে, ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লুম—হ্যাঁ, এইবার আপনি ভাল হ'য়ে বসুন না বউদি'! আপনিই হলেন আজ আমাদের বিচারক—

জ্যোতিষদা' দু'টো পানের খিলি মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বল্‌লেন—বিচারটা কিন্তু নিরপেক্ষভাবে করতে হবে, বুঝলে শুভা? 'বেচারা ঠাকুরপো' ব'লে তুমি যে শুধু ওর দিকেই টেনে······

—শুন্‌লেন বউদি'? কি রকম গাত্রদাহ! আপনি আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখেন ব'লে—

—মিছে কথা! আমি অমন হিংসুটে নই যে,······আচ্ছা, এইবার জজসাহেব বিচার আরম্ভ করুন, কিন্তু মামলাটা আদ্যোপান্ত না জেনে······

—সব জানি গো।······তুমি একটু চুপ করো দেখি!

বউদি' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ক'দিনের কথা ঠাকুরপো? রজনীকে তুমি পেয়েছিলে···

—গত ফাল্গুনে। এই সাত মাস হ'ল আর কি!

—এত দিন! এত দিন ধ'রে তোমাদের কোর্টশিপ্ চলছে? ধন্য!

—কোর্টশিপ্! বলো কি শুভা? এ যদি কোর্টশিপ্ হয়, তা'হলে ব্যভিচার আর কা'কে বলে?

—আঃ! তুমি থামো না বাপু!

বউদি'র শান্ত, সৌম্য মুখে ভ্রূকুটি জেগে উঠ্‌ল। উত্তেজিত, সতেজ মনে অতর্কিতে এসে-পড়া দ্বিধা বা দুর্ব্বলতাটুকু সবলে ঝেড়ে ফেলে আমি বেপরোয়া ভাবে বল্‌লুম—বল্‌তে দিন না বউদি'! ব্যভিচার, পাপাচার, যে যা' বুঝে থাকে বলুক—ডোণ্ট্ কেয়ার! আমি নিজের মনে তো বেশ জানি, আমার এ ভালবাসা নিষ্কলুষ, পবিত্র।

—বেশ, তাই যদি হয়, তা'হলে রজনীকে তুমি বিয়ে করো না কেন? ওকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তিটা কি?

—কিছু না, রজনীকে আমি পূজার ফুলটুকুর মত পবিত্র মনে করি বউদি'! আপনার কাছে সত্যি বল্‌চি, কিন্তু······বিয়ে তো আমাদের হ'য়ে গেছে অনেক দিন।

—সে কি গো? কবে? এত বড় একজন জমীদারের বিয়ে হ'ল, কেউ জান্‌লে না, কেউ শুন্‌লে না—এ কি রকম?

জ্যোতিষদা' আর চুপ ক'রে থাক্‌তে না পেরে ব'লে উঠ্‌লেন—কি ক'রে জান্‌বে? এ তো আর আমাদের ঢাক্-পেটা বিয়ে নয়? উপোস দিয়ে শুকিয়ে, টোপর মাথায় হনুমান্‌টী সেজে, সাত রাজ্যের লোক এক ক'রে, বাপ্ রে বাপ্! হয়রানের একশেষ আর কি?

—তা'হলে, এ সিভিল ম্যারেজ্ বুঝি?

—উহুঁ, সে তো তবু পদে ছিল, এ বিয়ে…কি বল্‌ব ? গান্ধর্ব্ব-মতে, নিভৃতে, লোকচক্ষুর অগোচরে !

বউদি'র বিস্মিত দৃষ্টি এবার জ্যোতিষদা'র মুখ থেকে স'রে আমার উপর পড়্‌ল, আমি থত-মত ভাব গোপন ক'রে তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—তা'তেই বা ক্ষতি কি বউদি' ? ঘটা ক'রে, পুরুত ডেকে দু'টো মুখস্থ করা মন্ত্র না আওড়ালে বিয়ে বুঝি সিদ্ধ হয় না ? এই যে মিলন — শুধু প্রাণে প্রাণে, প্রেমই যার মূল-মন্ত্র, অন্তরের প্রেরণাই যার পুরোহিত—

—থামো ঠাকুরপো ! অত বড় বড় কথা, আমার নিরেট মাথায় সহজে ঢুক্‌বে না। তার চেয়ে সোজা-সুজি…আচ্ছা, একটা কথা ঠিক ক'রে বলো দেখি—এ মিলনে তোমরা যথার্থই সুখী হয়েছ কি ?

আমি এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্‌লুম—নিশ্চয় ! এ কথা একবার নয়, একশোবার বল্‌ছি, আমি সুখী, পরমসুখী ! আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু…

—কেন বিশ্বাস করব না ভাই ? রজনীর মত মেয়েকে পেয়ে সুখী হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমি তাকে যতটুকু দেখেছি……

—আপনি রজনীকে দেখেছেন ? কবে ? কোথায় বউদি' ?

—বাঃ রে ! এরি মধ্যে ভুলে গেলে ? সেই যে সে দিন সিনে-মায়…মনে নেই ? আমার কিন্তু সকল সময় মনে পড়ে, যদিও সে ক্ষণিকের দেখা, একটী বই দু'টী কথা বল্‌তে সময় পাই নি, তবু বেশ মেয়েটী ! মুখখানি দেখ্‌লেই কেমন মায়া হয়, আর কথাবার্ত্তাও কি মিষ্টি !

—একেবারে মধু! মধু! ওঃ! আপনার অন্তর্দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ বউদি'! ক্ষণিকের দেখাতেই এত! ভাল ক'রে দেখলে না জানি···

আমি হাস্‌তে লাগলুম। বউদি' বল্‌লেন — ভাল ক'রে দেখার সুযোগ আর দিলে কই? এত ক'রে বলি, যখন আস্‌বে তখন রজনীকেও নিয়ে এসো, তা' আন্‌বে না তো!

—সে জন্যে আমাকে দোষ দেবেন না বউদি', আমি তো সাধাসাধি করি, তবু সে যে মোটে বেরোতেই চায় না। এমন 'কুনো' দেখি নি। বল্‌লে বলে, লজ্জা করে, কিন্তু লজ্জা যে কিসের, তা' তো বুঝি না!

—আহা! তাই যদি বুঝ্‌তে, তা'হলে আর······

বউদি' হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

—যাক্, তোমার নিজের কথাই তো শুনলুম, কিন্তু রজনী—সে মেয়েটী নিজের অবস্থায় বেশ সুখে আছে কি না, তার দিক থেকে অনুযোগ করবার কিছু আছে কি না, সেটা তলিয়ে দেখেছ কি?

—এর উত্তর আমার মুখে শোনার চেয়ে আপনি যদি একবারটী দয়া ক'রে দীনের কুটীরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেন বউদি', তা'হলেই ভাল হয়। নিজের মুখে বল্‌লে গর্ব্ব করা হবে, কিন্তু তাকে আমি যে অবস্থায় রেখেছি, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করেছি, তা'তেও যদি অভাব-অভিযোগ করবার কারণ কিছু ঘটে, তা'হলে বল্‌তে হয়, মেয়েদের ধর্ম্মই এই—দুঃখকে জোর ক'রে টেনে বা'র করাই যেন ওদের স্বভাব।

—তা' আমি মান্‌ছি, চোখে না দেখেও, তোমার দয়ায় রজনীর কোনো দিকে কোনো অভাব নেই। সোনাদানা, হীরেমোতি ছাড়া

মেয়েমানুষের জীবনে যা' প্রধান কাম্য—ভালবাসা, তা'ও তুমি দিয়েছ পর্য্যাপ্ত ভাবে, কিন্তু সব দিয়েও জীবনে ওর যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি র'য়ে গেছে ভাই !

—ফাঁকি ! এ ফাঁকি কিসের বউদি' ? ঐ মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে না করা ? হে ভগবান্ ! এইখানেই তো গলদ থেকে যায়, সংসারের নর-নারীর পবিত্র মিলনকে, মধুর প্রেমকে ঐ লৌকিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে কতকগুলো জটিল দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত ক'রে সমাজ আমাদের যে কি ক্ষতি করছে, সেটা যদি……

জ্যোতিষদা' এতক্ষণ সুবোধ বালকটীর মত চুপ ক'রে ব'সে একবার আমার, একবার বউদি'র মুখের পানে মিটু-মিটু ক'রে দেখছিল, এখন আর থাকতে না পেরে ব'লে উঠ্‌ল—ইস্ ! ক্ষতি ব'লে ক্ষতি ! বলো কি ভায়া ? এ যে একেবারে ভালবাসার গলা টিপে মারা হ'চ্ছে !

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম—ঠাট্টা নয় জ্যোতিষদা' ! সত্যি সত্যি, আমি নিজের মনে বেশ বুঝছি, বিয়ে করলে রজনীকে আমি এত মধুর, এমন গভীরভাবে ভালবাস্‌তে কখনই পারতুম না। এর মধ্যে একটা বাধ্য-বাধকতা এসে প'ড়ে আমাদের দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ, বৈচিত্র্য, তারুণ্য, মাধুর্য্য—সব বিস্বাদ ক'রে দিত।

—কিন্তু ঠাকুরপো, এ যে অবৈধ !

—আঃ ! কেন মিছে মাথা ঘামাও শুভা ? ও ফ্রী-লভের মর্ম্ম বোঝা কি তোমার-আমার কর্ম্ম ? বাপ-মা সেই কোন্ কালে পায়ে বেড়ী দিয়ে রেখে গেছেন পা দু'টো একদম বন্ধ ক'রে ! আমাদের জীবনটা একেবারে…কি বলব ? যাকে বলে, এঁদো পড়া—

বউদি' হাস্‌তে হাস্‌তে জ্যোতিষদা'র দিকে চোখের ইসারা ক'রে বল্‌লেন—আহা গো! মনে আপসোস থাকে কেন? এখনো সময় যায় নি, চুলে পাক ধরে নি, একবার চালচিঁড়ে বেঁধে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ো না কপাল ঠুকে, কাশী তো তেমন দূর নয়! ঠাকুরপোর মত তোমারও যদি তীর্থের ফল মিলে যায়—অমনি একটী—

—মহাভারত! তা' কি আর মিলবে? এ যে পাথর-চাপা কপাল গিন্নি! নেহাত জোটেই যদি, একটী ভৈরবী-টৈরবী! কাজ কি বাপু?

ছু'জনেই হেসে উঠ্‌লেন। আমি সে হাসিতে যোগ না দিয়ে বল্‌লুম—বাজে কথা থাক্ এখন, হ্যাঁ, আপনি কি বলছিলেন বউদি'? অবৈধ? কিন্তু সত্য কি অবৈধ হ'তে পারে? আমি যদি রজনীকে সত্যিকার ভালবাসাই বেসে থাকি, তা'হলে? আপনি বেশ ক'রে ভেবে······

—এতে ভাব্‌বার কিছু নেই ভাই। আচ্ছা, মোটামুটি একটা কথা বলি, যে রজনীকে তুমি রাণীর আসনে বসিয়ে পূজো করছ, সংসারে তার প্রতিষ্ঠা কি? সমাজ তাকে কোথায় স্থান দেবে? তোমার পরম ভালবাসার পাত্রী রজনী যদি দশের কাছে তার পরিচয় দিতে যায়, সে কি বলবে? জমীদারবাবুর রক্ষিতা—

—আরে ছ্যাঃ! তা' কেন? তুমি নেহাৎ সেকেলে গিন্নি! বল্‌বে, জমীদার পবিত্র মুখুজ্যের দয়িতা, বান্ধবী, অথবা—

—থামো! তোমার টিপ্পনীর জ্বালায় যে অস্থির! বলো ঠাকুরপো! তোমার রজনীর এখনকার পরিচয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তর সহসা যোগাল না। বউদি' বেছে-বেছে আমার মনের ঠিক্ দুর্ব্বল স্থানটীতেই আঘাত কর্‌লেন।

আমাকে নির্ব্বাক দেখে বউদি' আবার বল্‌লেন—তুমি ভুল করছ ঠাকুরপো! মস্ত বড় ভুল! তোমার পয়সা আছে, প্রতিপত্তি আছে তাই, আমাদের ঘরে হ'লে এদ্দিন···যাক্, এ ভুল সংশোধনের এখনো সময় আছে, আর দেরী না ক'রে তুমি রজনীকে বিয়ে ক'রে ফেলো ভাই, লক্ষ্মীটী!···সংসারে যা' চিরদিন হ'য়ে আস্‌ছে—

এতক্ষণে ধাতস্থ হ'য়ে বল্‌লুম—তাই করতে হবে! সেই কোন্ মান্ধাতার কালের সনাতন প্রথা, তার আর এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই! না বউদি', এখন পরিবর্ত্তনশীল নূতন যুগ, ওসব বিদ্‌ঘুটে বিধি-নিয়মগুলো তুলে দেওয়াই উচিত। মনের প্রসারতা, জীবনের সার্থকতা লাভ করতে হ'লে — লোক-লজ্জার, সমাজের ভ্রূকুটিতে ভয় পেলে তো চল্‌বে না।

বউদি' অপ্রসন্নমুখে বল্‌লেন — সে সাহস তোমার থাক্‌তে পারে, কারণ তুমি পুরুষ, কিন্তু রজনী······তার নারীত্বকে এ ভাবে লাঞ্ছিত করা তোমার উচিত হ'চ্ছে কি? শুধু-শুধু একটা খেয়ালের বশে একটী মেয়ের জীবন হেলা-ফেলা ক'রে···

—না না, তাই কি?

মর্ম্মাহত হ'য়ে বল্‌লুম—আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন বউদি'! আমি এত বড় পাষণ্ড নই যে, যাকে এত ভালবাসি, দেবীর মত শ্রদ্ধা করি, তার জীবনটা হেলা-ফেলায় ব্যর্থ ক'রে দেব। রজনী নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি

সম্পূর্ণ না হোক্, অনেকটাই তা'র হয়েছে, সে যদি আপত্তি করত—

—আপত্তি করে নি? আহা! কি বোকা মেয়ে গো!

বউদি' খানিক গুম্ হ'য়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সে বেচারী আপত্তি করবেই বা কি? তার নিজের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বাধীন সত্তা থাক্‌লে তো? তোমাকে সে ভালবেসেছে আত্মহারা ও সর্ব্বহারা হ'য়ে—প্রাণ লুটিয়ে। তুমি হাত ধ'রে তাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবে, একবারটী জিজ্ঞাসাও করবে না—এটা স্বর্গ, না নরক? বাস্তবিক ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরপো, ঐ সরলা মেয়েটীর জন্যে। তবে তার এই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা।

—আর আমার?

—তোমার? বল্‌ব?

বউদি' বিমর্ষমুখে একটু হেসে আমার পানে তাকিয়ে বল্লেন—রাগ ক'রো না ঠাকুরপো! তোমার এ ভালবাসা নয়, ভাল-লাগা!

জ্যোতিষদা' সোৎসাহে টেবিল চাপড়ে ব'লে উঠলেন—সাবাস্! সাবাস্ শুভা! যা' বলেছ লাখ টাকার কথা! ঠিক্ এই কথাটীই এত দিন আমার মনে এসেও মুখে আসছিল না, আশ্চর্য্য! কিন্তু ভায়া কি তা' স্বীকার করবেন? কখনো না!

স্বীকার করি আর না করি, কথাটার প্রতিবাদ করবার মত কোনো যুক্তি-তর্কই খুঁজে পেলুম না। কাজেই রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল তখনকার মত।

রাতের ফুল

মনের সে স্ফূর্ত্তি আর ছিল না।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলুম। একটা অবসাদের ভাব এসে পড়ছিল অন্তরে আমার, নির্ম্মল শরতাকাশে খণ্ড মেঘের মত। বাড়ী ফিরলুম, তখনো সেই ভাব, ফেরবার আগ্রহও বুঝি আজ রোজকার মত···নাঃ, আছে, আছে বই কি! এই যে রজনীকে কতক্ষণ দেখি নি—

গেটের কাছে মোটর ছেড়ে দিয়ে সরাসর উপরে উঠে গেলুম শোবার ঘরে। ঐ দখিনের বড় জানালাটায় সে রোজ এমন সময় ব'সে থাকে শত কাজ ফেলে আমারি প্রতীক্ষায়, সে স্থান আজ শূন্য কেন? যা' কোনো দিন হয় না, আগ্রহের মুখে বাধা পেয়ে মনটা আরো দমে গেল, এই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ কারণেই! মানুষের মন কি হাল্কা!

শুনলুম, অল্পক্ষণ হ'ল রজনী তেতলায় গেছে। হয়তো আমার দেরী দেখেই, কিন্তু এ রকম দেরী আগেও কতবার হয়েছে—তবে আজ···কি মুস্কিল! কেবল ঐ চিন্তা! বউদি' আমার মাথায় আজ কি যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন!

কাপড় ছেড়ে, ঝিমিয়ে-পড়া মনটাকে একটু চান্‌কে নিয়ে তেতলায় গেলুম। দেখ্‌লুম, দখিন-দুয়ারী ঘরখানার সাম্‌নে যে খোলা ছাদটুকু, সেইখানে মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে রজনী, একলাটী, চুপ ক'রে কি যেন সে ভাবছিল তন্ময় হ'য়ে। সে তন্ময়তা এত গভীর যে, আমার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলে না, এত কাছে এসেও, এমন কি ভাবনা তা'র?

যাই হোক্‌···বড় ভাল লাগ্‌ল দেখ্‌তে।

রাতের ফুল

শুক্লা সপ্তমী, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রজনীর সারা অঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে।

শুভ্র অনাবৃত বাহুর 'পরে তার ছোট্ট মুখখানি যেন চামেলী ফুলটীর মত ফুটে রয়েছে।

শুভ্র কণ্ঠে শুভ্র মুক্তার কণ্ঠী; কাণে মুক্তার দুল, পরিচ্ছদও আগাগোড়া সাদা, সাদা সেমিজের উপর ধপ্‌-ধপে শান্তিপুরী শাড়ী—জরীর পাড়টুকু তার ম্লান চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না। পালিশের চিক্‌চিকে সরু চুড়ী ক'গাছি যেন হাতের রংয়ে, জ্যোৎস্নার রংয়ে মিশে গিয়েছে। সমস্তই শুভ্র।

রজনী সাদাই ভালবাসে বুঝি? যে দিন তাকে প্রথম দেখি, সেদিনও তো এম্‌নি······সাদাই ওকে বেশী মানায় হয়তো, কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগে না, কি জানি কেন? অত বেশী শুভ্রতা মনকে কেমন উদাস ক'রে দেয় যেন, সংসারে বাঁচ্‌তে হ'লে জীবনে একটু রংয়ের আমেজ চাই না কি!

কিন্তু, রজনীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ — যেন গ্রীক্‌-শিল্পীর যত্নে-গড়া শুভ্র মর্ম্মর-প্রতিমা একখানি!

এ শুভ্র নিথর সৌন্দর্য্য, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য নীরবে উপভোগ কর্‌বার জিনিস। আমার অবস্থা তখন সে রকম নয়, তাই মিনিট কতক দাঁড়িয়ে থেকেই আমি অধৈর্য্য হ'য়ে ডাক্‌লুম — রোজি!

রজনী চম্‌কে গিয়ে উঠে বস্‌ছিল, বাধা দিয়ে আমি তার পাশে ব'সে বল্‌লুম—থাক্‌, উঠ্‌ছ কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

রাতের ফুল

রজনী সলজ্জভাবে বল্‌লে—না, এ কি ঘুমের সময়? এমনি একটু শুয়েছিলুম, বেশ জ্যোৎস্না তাই—

—ভালই তো, কিন্তু একলাটী কেন? বিশুর মা রান্না ঘরে বুঝি? কি যে দশা ওদের, রান্না ঘরে জটলা না পাকালে—

—না, বিশুর মা তো আমার কাছেই ছিল, আমিই বল্‌লুম যেতে—

—কেন?

—কি দরকার সকল সময় আগ্‌লে থাকার? ভাল লাগে না—

—কি ভাল লাগে না? বিশুর মা'কে? তার অপরাধ? বেচারী বুড়ো হয়েছে বলেই কি···

—না, তা' কেন?

একখানি হাত আমার কোলের উপর রেখে রজনী সলাজ মধুর হাসি হেসে বল্‌লে—আচ্ছা, সময় সময় একটু একলা থাক্‌তে ভাল লাগে না কি?

—তা' লাগ্‌তে পারে, কিন্তু তোমার আজকাল বেশ একটু সাহস হয়েছে দেখ্‌ছি। আগে তো সন্ধ্যে হ'লে একদণ্ড এক্‌লা থাক্‌তে পারতে না, আমার একটুখানি দেরী হ'লেই···ওঃ! সে কি অভিমানের ঘটা! এখন তো আর সে রকম দেখি না।

—তখন নেহাৎ অবুঝ ছিলুম তাই, এখন যে বুঝতে পারছি···

—কি? কি বুঝতে পারছ?

রজনী নিরুত্তর।

কোলের-উপর-রাখা এলিয়ে-পড়া হাতখানা তার তুলে নিয়ে গলায়

জড়িয়ে ব্যগ্রতার সঙ্গে বল্‌লুম — বলো না রোজি ? কি বুঝেছ এখন, বলো ?

রজনীর আনত চোখ দু'টী বেশ ডাগর না হলেও ঘন পক্ষ্মঘেরা, অলস ঢুলু ঢুলু, বড় মধুর—সে আঁখি দু'টী তুলে আমার পানে তাকিয়ে, কুণ্ঠিতস্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লে — এই — কি আর বল্‌ব ? ভগবান্ যখন আমাকে একলা করেছেন, তখন আর বৃথা অনুযোগ ক'রে—

—মিছে কথা, দুষ্টু ! ভগবানের সেই ইচ্ছাই যদি ছিল, তা'হলে এমন একটা ছন্নছাড়া সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন কেন ? আর বুঝি ভাল লাগে না এ সঙ্গীটীকে ? এ্যাঁ, কি বলো ?

আমি আদর ক'রে রজনীর ফুলের মত পেলব হাল্‌কা দেহখানি বাহু-বেষ্টনে টেনে নিলুম।

রজনী আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে চুপ ক'রে রইল।

শ্লথ তার বাহুখানি আমার গলায় লুটিয়ে পড়েছে একছড়া জুঁইয়ের গড়ে মালার মত, তেমনি স্নিগ্ধ, কোমল পরশ তার, আবেগের এতটুকু উত্তাপ নেই তাতে !

আশ্চর্য্য ! রজনীকে যখনই আদর করি, তখনই সে এমনি ক'রে নীরবে এলিয়ে পড়ে !

জানি, তার প্রেম গভীর, একান্ত নির্ভরশীল, কিন্তু সে প্রেমে এমন একটু উচ্ছ্বাস কি উদ্দামতা নেই বুঝি, যা' প্রেমাস্পদের বিহ্বল প্রাণে উন্মাদনা জাগিয়ে······নাঃ ! একটা-না-একটা অশান্তি লেগেই আছে, মানুষের কি যে স্বভাব !

রজনীর মনেও যদি এমনি কোন অশান্তি থাকে, বউদি' যে বল্‌ছিলেন—

আগ্রহভরে বল্‌লুম—রোজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, সত্যি সত্যি বল্‌বে ?

রজনী মুখ না তুলেই বল্‌লে—কি ?

—বল্‌ছিলুম, তুমি কি নিজেকে যথার্থই সুখী মনে করো ? আমার কাছে তোমার অনুযোগ-অভিযোগ কর্‌বার কিছু নেই কি ?

রজনী নীরব। শুধু একটা চাপা গাঢ় নিঃশ্বাস আমার বুকের 'পরে অনুভব করলুম।

—থাকে যদি বলো, আমার কাছে সঙ্কোচ ক'রো না। আমি তোমাকে অসুখী করছি না তো ?

অসহিষ্ণু ভাবে ব্যাকুল আগ্রহে আমি রজনীর অবনমিত মুখখানি তুলে ধরলুম, শুভ্র মুখখানি চাঁদের আলোয় টুল্‌ টুল্‌ করছে, অশ্রু-জলের একটী ফোঁটা যেন…

—বলো রোজি, চুপ ক'রে থেকো না।

—কি বল্‌ব ? পথের কাঙালকে কুড়িয়ে এনে যে সিংহাসনে বসাতে পারে, তাকে বল্‌বার আর কি আছে ?

ধরা-গলায় গাঢ় স্বরে কথাটা ব'লে রজনী আমার মুখ পানে চেয়ে রইল অনিমেষ হ'য়ে।

করুণতা মাখা কি কোমল মধুর দৃষ্টি তার! কিন্তু তাতে সেই বিহ্বলতা কই ? উদ্বেলিত উচ্ছ্বল হিয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা, যাতে পরিতৃপ্ত……দূর করো ছাই!

খালি নেই নেই! এ সব ত্রুটী-বিচ্যুতি এতদিন চোখে পড়ে নি তো? কি জানি, কি যে হয়েছে এখন, থেকে থেকে এম্‌নি একটা অতৃপ্তির ভাব মনের কোণে এসে প'ড়ে বিষণ্ণ ছায়া ফেলে। কিন্তু এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

না, আর যেন এমন না হয়, আমি যা' পেয়েছি, তাই যথেষ্ট—আমি সব পেয়েছি!

অধীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রজনীকে আমি বুকে চেপে ধরলুম।

—ভুল বল্‌ছ রোজি! পথের কাঙ্গাল নয়, রত্ন! আমার কত ভাগ্য যে, এ রত্ন পথের ধূলোয় কুড়িয়ে পেয়েছি···

রাত্রে রজনীকে বল্‌লুম—বউদি' তোমাকে ডেকেছেন রোজি!

—কে বউদি'?

—সেই যে জ্যোতিষদা'র স্ত্রী গো! যিনি তোমাকে সেদিন সিনেমায়—

—ও! তিনি?

—হ্যাঁ, বেশ মানুষটী, না?

—চমৎকার! তাঁকে একবার দেখেই যেন কত দিনের চেনা মনে হ'ল।

—তোমাকেও তাঁর বড্ড ভাল লেগেছে না কি! যখনি যাই তখুনি বলেন, 'রজনীকে নিয়ে এলে না কেন?' যাবে একদিন? চলো না, কালই তোমাকে নিয়ে যাই তাঁর কাছে, কত খুশী হবেন।

—খুশী হবেন ?

—না তো কি রাগ করবেন ? ওঁরা সে প্রকৃতির লোক ন'ন রোজি ! তুমি জানো না তাই, আমাকে কি রকম স্নেহ-যত্ন করেন।

—তা' করতে পারেন, কিন্তু—

—এতে আর কিন্তু নেই, বলো, কাল যাবে তো ?

—না !

আর একদিন রজনীকে এমনি দৃঢ়তার সহিত অকুণ্ঠিতভাবে 'না' বল্‌তে শুনেছিলুম, যে দিন তাকে বোর্ডিংয়ে রাখার প্রস্তাব…যাক্, সে সব কথা পরে হবে।

রজনী সহজে রাজী হবে না জানতুম, তাই ব'লে এমন স্পষ্ট অস্বীকার…ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লুম—কেন বলো দেখি ? আমার সঙ্গে যেতে তোমার বাধা কি ?

রজনী শয়নের উদ্যোগ করছিল, আমার পানে চকিতে চেয়ে চোখ দু'টী নামিয়ে নিয়ে সে আস্তে আস্তে বল্‌লে—বাধা আছে কি না জানি নে, কিন্তু আমি যেতে পারব না, ক্ষমা করো আমাকে, তুমি দয়া ক'রে যেখানে স্থান দিয়েছ, সেইখানেই থাকতে দাও।

—দয়া ক'রে !

অন্তরে আমার অতর্কিতে একটা আঘাত লাগ্‌ল।

—এ ধারণা তোমার মনে আজও রয়েছে ? আশ্চর্য্য ! তুমি এত দিনেও আমাকে ঠিক্ বুঝ্‌লে না রজনী ?

—বুঝেছি ! ওগো, খুব বুঝেছি আমি ! এর বেশী বুঝ্‌তে আর চাই নে ! মাপ করো আমাকে !

বল্‌তে বল্‌তে—রজনী ঝুপ্‌ ক'রে শুয়ে পড়ল বালিশে মুখ গুঁজড়ে।

তার কম্পিত কণ্ঠ-স্বরে, কথা বল্‌বার ভঙ্গীতে বিদ্রোহীর ভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু কেন? আমার অপরাধ?

আমার আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হ'ল না। কতক্ষণ বাদে চমক-ভাঙ্গা হ'য়ে দেখি, রজনী তেমনি ভাবে শুয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসে বোধ হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমোক্‌।

আমার যে চোখের পাতা বোজে না, এ কি অস্বস্তি ধরল আজ! একে মনের অবস্থা তেমন ভাল নয় কয়েকটা ছোট-খাট ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, তারপর রজনীর এই অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর আমাকে শুধু ক্ষুব্ধ নয়, একটু উদ্বিগ্নও ক'রে তুলেছিল।

ঘুরে-ফিরে কেবলি মনে পড়ে বউদি'র কথা। আমি কি বাস্তবিকই রজনীর প্রতি অবিচার করছি? তাই যদি হয়, তবে সমাজের চক্ষে— ভগবানের চক্ষে নয়! তিনি তো জানেন, রজনীকে আমি কি ভীষণ আবর্ত্ত থেকে তুলে কোথায় এনে রেখেছি, তা'র মত ভাগ্য-বিড়ম্বিতার জীবনে এর চেয়ে ভাল আর কি হ'তে পারত?

গাঁটছড়া বেঁধে বিয়ে না করলে বুঝি নারীর নারীত্ব চরিতার্থ হয় না?

এই যে ধন দিয়ে, মান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে আরাধনা—এ কি কিছু নয়?

কি জানি মেয়েদের মন…কবি যথার্থই লিখেছেন—

রাতের ফুল

"........................রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা! সাধনার ধন!"

রজনীকে আমি বিবাহ না করার কারণ সবাই যা' বুঝেছে, রজনীরও তাই বিশ্বাস এখন পর্য্যন্ত, নইলে এত ক'রেও তার মনে... আচ্ছা, আমি কি যথার্থই ভুল পথে চলেছি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার অন্তর থেকে আপনিই সাড়া আসে 'না'।

কিন্তু আজ তো এলো না!

একটা গভীর নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত হ'য়ে দেখলুম রজনী পাশ ফিরে শুয়েছে। নিদ্রালস শিথিল তনুলতা তার শুভ্র-কোমল শয্যায় ডুবে গিয়েছে যেন।

এলোমেলো চুলের মাঝখানে সুপ্তি-মাখা মুখখানি তার বড় সুন্দর, বড় করুণ দেখাচ্ছিল—ঐ করুণতাই বুঝি ওর সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব! দেখ্‌লেই মায়া হয়, বউদি' মিছে বলেন নি তো!

সে মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার বিগলিত দরদী-চিত্তে জেগে উঠ্‌ল আর একদিনের চিত্র, যেদিন রজনীকে প্রথম দেখি—শরতের এক উজ্জ্বল সন্ধ্যায় কাশীতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের বিচিত্র জন-সমারোহের মধ্যে।

মূর্চ্ছিতা জননীর পাশে ব'সে সে আকুল হ'য়ে কাঁদছিল। চারিদিক ঘিরে রয়েছে কুতূহলী জনতা।

মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো—সবাই আছেন।

—ও মাগো! কি ক'রে প'ড়ে গেল? পা পিছ্‌লে বুঝি?

—হ্যাঁ গা! একবার নাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি, নিঃশ্বেস পড়ছে কি না?

—মাগীর মির্‌গী আছে নিশ্চয়, তা' অমন রোগ নিয়ে ঘাটে আসবার কি দরকার ছিল?

—আরে বাপু! ব'সে ব'সে কাঁদ্‌লে কি হ্‌বে আর? মুখে-চোখে একটু গঙ্গাজল দাও। দাঁত-কপাটি লেগেছে না কি? ওমা! তবেই তো মুস্কিল!

—আচ্ছা, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে খবর দিলে হয় না? মরেই যদি যায়...

এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে অনর্থক ভিড় জমিয়ে তুলেছে তারা, কিন্তু এগোচ্ছে না কেউ-ই।

—আপনারা দয়া ক'রে একটু স'রে দাঁড়ান দেখি, নইলে উনি যে দম-আট্‌কে মারা যাবেন!—

ব'লে আমি দু'হাতে ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রজনী তার অশ্রুভারাকুল আর্ত্ত নয়ন দু'টী আমার পানে তুলে ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি ডাক্তার?

সেই আমাদের শুভদৃষ্টি!

তার সেই শঙ্কা-ব্যথাতুর বিবর্ণ মুখে, সজল চোখে, আলু-থালু শুভ্র বেশে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের ঢেউ লেগেছিল, সে মধুর ছবি যে আজও চোখের সামনে রয়েছে আমার!

থাক্, কি বলছিলুম? হ্যাঁ, রজনীর মা'কে বাঁচানো গেল না।

রাতের ফুল

বেরিবেরি রোগে দীর্ঘকাল ভুগে জীবনীশক্তি তাঁ'র ক্ষয় হয়েছিল—হার্টও ছিল খারাপ, তার উপর হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে, কাজেই…

ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, পথ্য কিছুতেই কিছু হ'ল না।

সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

জ্ঞান একবার হয়েছিল সকালের দিকে মুহূর্ত্তের জন্যে, তার মধ্যে পরিচয় নেবার বা দেবার সুযোগ আর হ'য়ে ওঠে নি।

আমার শুধু নামটুকু জেনেই তিনি পরম আশ্বাসভরে—ব্রাহ্মণ? আঃ!…আমার রজনীকে আপনি…ব্রাহ্মণ-কন্যা…নিষ্পাপ…

বল্‌তে-বল্‌তেই সেই যে চক্ষু বুজলেন—ব্যস্‌…সেই প্রথম ও শেষ বাক্য তাঁর।

তারপর রজনীর কাছে কথায়-কথায় যতদূর জেনেছি, তাতে সব পরিষ্কার হয় না।

রজনীর অতি শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হয়, তাঁর নাম অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, পিতার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র তার অভিজ্ঞতা।

মাতা বিধবা হ'য়ে পর্য্যন্তই রজনীকে নিয়ে কাশীতে বাস করেছেন, তাঁদের সাহায্য করবার কেউ ছিল না।

অসহায়া অনাথিনী—বিশেষ পরিশ্রমে কাপড় সেলাই ক'রে, জরীর পাড় বুনে, ছোট ছোট মেয়েদের পড়িয়ে, পাল-পার্ব্বণে, সময়ে অসময়ে গৃহস্থদের ঘরে কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে সংসার চালাতেন। বিধবার সঞ্চয়ও সামান্য কিছু ছিল, কিন্তু সব গেছে রোগের জন্যে।

এই একমাত্র মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ আপন আছে কি না, রজনী তা' জানে না, এই তার পরিচয়, সুতরাং…

সমাজ তাকে স্থান দেবে কোথায়? আমিও সেই সমাজেরই একজন, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে আমার একটু নয়, অনেক স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমতঃ আমি অবিবাহিত এবং অভিভাবক শূন্য, আমার স্বাধীন মতে হস্তক্ষেপ করে, এমন কেউ ছিল না।

তারপর অর্থবল।

তথাপি রজনীকে নিয়ে প্রথমটা বিব্রত হ'তে হয়েছিল কম নয়। রজনীর মা যখন ওকে আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন, তখন তাঁর মনোগত ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, তবে রজনীর মুখেই শুনেছি, সে লেখাপড়া-কাজকর্ম্ম শিখে স্বাবলম্বী হ'তে পারে, এই রকম উদ্দেশ্য তাঁর মনে প্রথম থেকেই ছিল। শেষের দিকে অসুখে পড়ায় তাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়, অসহায়া কন্যার ভার কা'র হাতে দিয়ে যাবেন, এই চিন্তায় বিধবার আহার-নিদ্রা ত্যাগ হয়েছিল। উপযুক্ত একটী ভারবাহীর সন্ধানও না কি তলে তলে চলছিল রজনীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও!

পাড়া-প্রতিবাসীরাও ওঁদের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বল্‌তে পারলেন না। এ অবস্থায় একটী বয়স্থা ভদ্রকন্যাকে নিয়ে আমি…

রজনীকে 'ভদ্রকন্যা' বল্‌তে আপত্তি করবেন না, এমন লোক আমাদের সমাজে ক'জন আছেন জানি না, তবে আমার…বলেছি তো আমার মত শুধু উদার নয়, সৃষ্টিছাড়া—

আমি সেই মৃত্যু-পথযাত্রিণীর শেষ বাক্যে অসংশয়ে বিশ্বাস করি,

নিজের মনে জানি, রজনী নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু এ কথা অপরে বিশ্বাস করবে কেন ?

এই অপরিচিতা বয়স্থা মেয়েটীকে নিয়ে আমি কি করি, কোথায় রাখি, সে হুঁস হ'ল আমার হাওড়া-ষ্টেশনে নেমে।

কল্‌কাতায় আমার ঝি-চাকর নিয়ে সংসার, সেখানে রজনীকে রাখ্‌তে আমার আপত্তি না থাক্‌লেও রজনীর হ'তে পারে, সে তো আর খুকীটী নয়!

অবশ্য দেশের বাড়ীতে আমার আত্মীয়-আত্মীয়ার অভাব নেই, এক জ্যাঠাইমাও আছেন, যাঁর তত্ত্বাবধানে রজনীকে কিছুদিন স্বচ্ছন্দে রাখা যায়, কিন্তু সেখানে পল্লীগ্রামের শুচিতার আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া রজনীর পক্ষে অসম্ভব, কাজেই ওকে নিয়ে ফাঁপরে পড়তে হ'ল।

ভবানীপুরে·········ষ্ট্রীটে, আমার এক মাসিমা আছেন। আমার মায়ের খুড়তুতো বোন্, তাঁরা শিক্ষিত সুসভ্য সম্প্রদায়ে মেলা-মেশা করেন, আধুনিক ষ্টাইলে থাকেন। মাসিমার তিন মেয়ে, বড়টীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, ছোট দু'টী বেথুনে পড়ে, বেশ সভ্য-ভব্য সুখী পরিবার। রজনীকে সেখানে রাখ্‌তে পারলে বড় সুবিধে হয়।

কথাটা মনে আস্‌তেই রজনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম কপাল ঠুকে। হতাশ হ'তে হ'ল না। বিপন্না অসহায়া বালিকার প্রতি করুণা পরপরবশ হ'য়েই হোক্, কিম্বা খামখেয়ালী বোন্‌পোটীর উপরোধে পড়েই হোক্, মাসিমা রজনীকে কাছে রাখ্‌তে আপত্তি করলেন না, বরং রজনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে — বেশ

মেয়েটী তো ! — ব'লে একটুখানি মুখ টিপে হাস্‌লেন। সে হাসির প্রচ্ছন্ন অর্থ সুস্পষ্ট ক'রে দিলে মাসিমার বড় মেয়ে সুজাতা। সে মায়ের কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌লেও বেশ শুন্‌তে পেলুম— পবিত্রদা'র বিয়ের ফুল এবার ফুটেছে মা ! নইলে এ মেয়েটী কোত্থেকে…

মেজ মেয়ে অজিতা ফিক্ ক'রে হেসে ব'লে ফেল্‌লে—বা রে ! এ যে বঙ্কিমবাবুর সেই রজনী ! রজনী, ধীরে—!

দেখ্‌লুম রজনীর শুভ্র গাল দু'টীতে একটু লালের আভাস, কথাগুলো তার কানেও গিয়েছিল নিশ্চয়। যাক্—যে যাই বলুক, এত বড় একটা দায়িত্ব যখন ঘাড়ে নিয়েছি, তখন লজ্জা-সঙ্কোচ করা চল্‌বে না তো !

রজনীকে বল্‌লুম—তা'হলে তুমি মাসিমার কাছে থাকো রজনী, আমি শীগ্‌গিরই তোমার পড়া-শোনার ভালরকম ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তোমার কি ইচ্ছে ? পড়বে তো ?

রজনী সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—সেখানে স্কুলে পড়তে বুঝি ? কতদূর পড়েছ ?

—সেভেন্থ্ ক্লাশে পড়ছিলুম, তারপর মা'র অসুখে……

বাধা দিয়ে শান্তা ব'লে উঠ্‌ল—মো—টে ! দিদি যে এ বয়সে আই-এ দিয়েছিল, তোমার বয়স কত ? আঠারো-উনিশ হবে না ?

রজনী মাথা হেঁট ক'রে উত্তর দিলে—না ষোলো চল্‌ছে।

—তা'হলে মেজদি'র বয়সী বলো, সেজদি' যে এবার ম্যাট্রিক—

—আঃ ! তুই থাম্ না শান্তা ! সবাই কি সমান পড়তে পারে ?

এই তো এবার আমাদের স্কুলে একটী মেয়ে আমারি সমবয়সী, সে ভর্ত্তি হ'ল সিক্সথ্ ক্লাসে, তাতে কি হয়েছে? ভাল পড়তে পারলে প্রমোশনের···

মাসিমা বল্লেন—সে হবে এখন বাপু। তাড়াতাড়ি কি? আগে একটু বিশ্রাম করুক, খোকনের যা' চেহারা হয়েছে, কেবল ঘুরে ঘুরে, পারেও তো এত ঘুরতে!

যাক্, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্লুম, বড় ভাবনা হয়েছিল রজনীর জন্যে। এখানে থেকে মাসিমার মেয়েদের সঙ্গে লেখা-পড়া করুক এখন, তারপর দেখা যাবে ওর যেমন ইচ্ছে, মেয়েদেরও একটা স্বাধীন মতামত আছে তো!

ভাব্তে ভাব্তে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ কিসের একটু শব্দে থম্‌কে দেখি রজনী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমাকে ফিরতে দেখে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে এসে বল্লে—আপনি—আস্‌বেন তো?

কি ব্যাকুল সে প্রশ্ন! ছল-ছল চোখ দু'টীতে তার কি অসহায় বেদনা!

বুকের ভিতর যেন টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌ল—আমাকে এমন ক'রে কেউ তো কোন দিন···

—হ্যাঁ, আস্‌ব বই কি! আমি রোজ আস্‌ব রজনী! ভয় কি? এই তো কাছেই আমার···

কথাটা ব'লেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে মোটরে বসলুম। আমার মন তখন এত চঞ্চল!

বুঝতে পারলুম না এ চাঞ্চল্য কিসের? পুলকের না ব্যথার?

রজনীকে ব'লে এসেছিলুম 'রোজ আস্‌ব' কিন্তু তা' আর হ'ল না। বাড়ী ফিরেই আমার জ্বর, সে জ্বর ছাড়ল তিন দিনের দিন, সেই দিনই বিকেলে বেরোব মনে করছি — এমন সময় স্বয়ং মাসিমা এসে হাজির! তাঁর গম্ভীর মুখে উদ্বেগের ছায়া। আমি কিছু বল্‌বার আগেই তিনি ব'লে উঠ্‌লেন — হ্যাঁ খোকন্! তোর কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি? এত লেখা-পড়া শিখে শেষে এই বুদ্ধি......

শঙ্কিত হ'য়ে বল্‌লুম—কি? কি হয়েছে মাসিমা?

—হবে আর কি, আমার মাথা! ওই যে মেয়েটী—রজনী, ওর যে জাত-জন্মের কিছু ঠিক্ নেই, তা' তো আমাকে—

—সে কি? কে বল্‌লে?

—কে আর বল্‌বে? ও নিজেই তো কথায় কথায় মেয়েদের কাছে ব'লে ফেলেছে। আরে, এ সব কথা কি চাপা থাকে বাবা? বিধবা হ'য়ে মা'য়ের বৈরাগ্য হ'ল, তাই কচি মেয়ে নিয়ে একলাটী চ'লে এলো কাশীবাস করতে! বেশ, বাপের মুখ না হয় না-ই দেখলে, আর কেউ আত্মীয়-কুটুম্ তিন কুলের কারো পাত্তা নেই কি? এতে কি বোঝায় বল্ তো?

—কিন্তু মাসিমা, এমনও তো হ'তে পারে যে,—

—না বাবা, আর কিছুই হ'তে পারে না! তুমি জান না কাশী কি রকম সহর — ও মাগী ঠিক্ ওই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর যা' হয় তাই!

অন্তরে আহত হ'য়ে বল্‌লুম—এ সন্দেহ আমার মনেও যে আসে

নি এমন নয়, কিন্তু মাসিমা, ধরুন, সন্দেহ যদি সত্যই হয়, তা'হলে ও বেচারীর অপরাধ কি? ও যদি নিজে নিষ্পাপ হয়—

—তবুও, মায়ের কলঙ্কের ছাপ সন্তানের জীবনে পড়বেই যে; বিশেষতঃ মেয়ে সন্তান, তুমি আমি নিষ্পাপ বল্‌লে সমাজ তো শুন্‌বে না।

—না-ই বা শুন্‌লে! সমাজের ও সব ভ্রূকুটি আমি মানি না।

—তুমি না মান্‌লেও আমাকে যে মান্‌তেই হয় বাবা! এই তো কাল জামাই এসেছিলেন, কত রাগ করতে লাগলেন শুনে। আবার কুটুমবাড়ীতে যদি কথাটা ওঠে···না খোকন্, আমি ওকে রাখতে পারব না বাবা, দু'-দু'টী মেয়ে আইবুড়ো ঘরে, শেষে একটা কেলেঙ্কারী হ'য়ে পড়লে তখন—

—না মাসিমা! আপনি ভাববেন না, আমি রজনীর একটা ব্যবস্থা শীগ্‌গিরই ক'রে ফেল্‌ছি! চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়েই···

—কি ব্যবস্থা করবে?

—যা' ভাল মনে হয় তাই···ওকে এ অবস্থায় ফেল্‌তে তো আমি পারব না!

—তা' তো বটেই!

গম্ভীর মুখে খানিক চিন্তা ক'রে মাসিমা বল্‌লেন—হ্যাঁ খোকন্! এক কাজ করলে হয় না? ও মেয়েটাকে যদি বোর্ডিংয়ে রেখে দাও—

—দেখি, ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে, ও যদি রাজী হয়, তা'হলে···

—রাজী যে হ'তেই হবে, এ ছাড়া ও মেয়ের আর গতি নেই!

গাড়ীতে ব'সে মাসিমা ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লেন—খোকন্, রাগ

করিস্ নে বাবা, তোর ভালর জন্যেই আমি···আজ তোর মা কি বাপ থাকলে আমার বলার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু তা' তো নেই; কাজেই বলতে হ'চ্ছে···

মাসিমার সঙ্কোচ দেখে আমার ভয় হ'ল, না জানি আবার কি গোপন তথ্য আবিষ্কার করলেন তিনি!

উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বল্‌ছেন, বলুন না?

মাসিমা ঢোক গিলে বাধ-বাধ ভাবে বল্‌লেন—বল্‌ছিলুম রজনীকে বোর্ডিংয়ে রাখাই ভাল। কি জানি, মানুষের মন, বলা তো যায় না, শেষকালে যদি···নাঃ, ও মেয়ে তোমার উপযুক্ত নয় বাবা, তোমাদের এত বড় বংশ-গৌরব, এত সম্মান, ছিঃ! আর এমনি কি সুন্দরী ও! রোগা, ঢ্যাঙ্গা, রংটুকুই যা' সাদা ফ্যাক্-ফ্যাকে, কড়ির পুতুলের মত। ও কি তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য? রামঃ! কিসে আর কিসে!

মাসিমার সেই অযাচিত উপদেশ বা আদেশ মাথা পেতে নিলুম তখনকার মত, তবে শেষ পর্য্যন্ত নয়।

মনে করেছিলুম সেদিন রজনীর সঙ্গে দেখা ক'রে বোর্ডিংয়ে থাকা সম্বন্ধে তার মতামত জেনে চ'লে আস্‌ব, কিন্তু মাসিমাদের বাড়ীর হাব-ভাব দেখে রজনীকে সেখানে আর রাখ্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না। ফেরবার সময় আমি ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলুম। মাসিমা মুখে একবার—এত তাড়াতাড়ি কিসের বাপু? জলে তো প'ড়ে নেই?—বল্‌লেও তিনি যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, তা' বেশ বোঝা গেল।

রজনীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাকে আর একবার সতর্ক ক'রে

মাসিমা যখন ফিরে গেলেন, শুনতে পেলুম সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে তিনি আপসোস ক'রে বল্‌ছেন—ও কি আর সহজে ছাড়বে? হুঁ! একে কাশীর মেয়ে, তায় ওই রকম, কত মন্ত্র-তন্ত্র জানে ওরা। সত্যি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে ছেলেটার জন্যে।

তাঁর কথা শুনে রাগও হ'ল, হাসিও পেল। রজনী একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে পাথরের পুতুলটার মত!

তার মনে তখন কি জানি কি ভাব—

আমি পাশের সীটে ব'সে ধীরে ধীরে ডাক্‌লুম — রজনী!

রজনী আনত মুখখানি তুলে বল্‌লে—কি বল্‌ছেন?

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, গাড়ীর ভিতর আলো নেই। ঝাপ্‌সা আঁধারে সে-মুখের পানে খানিক নীরবে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি বোর্ডিংয়ে থাক্‌তে পারবে?

—কেন পারব না? আপনি যদি বলেন, তা'হলে—

—উহুঁ, আমার বলায় কি হয়? তোমার নিজের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে! বোর্ডিংয়ে থাকায় তোমার আপত্তি থাকে যদি—

—না, আপত্তি কিসের? কিন্তু—

—কিন্তু কি? বলো, আমার কাছে তোমার সঙ্কোচ করলে তো চল্‌বে না, তোমার মা যে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন রজনী! তোমার সুখ-দুঃখের জন্য আমাকে দায়ী হ'তে হবে এখন, তাই বল্‌ছি, যদি তুমি কষ্ট বোধ না করো—

—কষ্ট নয়, লজ্জা। সেখানে তো একটী-দু'টী নয়, অনেক মেয়ে।

তাদের কাছে যদি এমনি জবাবদিহি করতে হয়, তা'হলে আমি যে···
না, না, আমি তা' পারব না, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।

রজনী মুখে হাত চাপা দিয়ে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

মায়ের মৃত্যুর পর ওকে এমন ক'রে কাঁদতে আর দেখি নি। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি মেয়েটীর অসাধারণ ধৈর্য্য দেখে, সে ধৈর্য্য আজ ভেঙ্গে গেছে! সামান্য আঘাত তো নয়!

ব্যথিত হ'য়ে বল্‌লুম—থাক্ রজনী! তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই আর, তুমি আমার কাছে থাক্‌বে, কেমন?

রজনী চোখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে ধরাগলায় বল্‌লে—যদি দয়া ক'রে রাখেন, আমি আপনার বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে···

—ছিঃ! ও কি কথা? তুমি থাক্‌বে আমার শূন্য ঘরের লক্ষ্মী হ'য়ে, আমার সঙ্গীহারা জীবনের সাথী হ'য়ে···

আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমি রজনীর হাত ধ'রে···সেই আমার পাণিগ্রহণ করা! সে হাত আর ছাড়ি নি তো! ছাড়তেও পারব না জীবনভোর!

এ হ'ল কিনা শুধু ভাল-লাগা, বড় লোকের খেয়াল! আর ওই যে আমাদের পাড়ার চৌধুরীর ছেলে নবীন, মাসের মধ্যে দশ দিনও বাড়ী থাকে না, থাক্‌লেও স্ত্রীকে না ঠেঙ্গিয়ে জল গ্রহণ করে না—তবু লোকে ওর ভালবাসা অস্বীকার করবে না, ওর বাপ-মা, স্ত্রী নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছে, ও যাবে কোথায়?—এ যে সাত পাকের বাঁধনে বাঁধা!

অপরূপ বিধান! সাত পাকের বাঁধনে ছাড়াছাড়ি হবার ভয় নেই, মারামারিই করুক, আর কাটাকাটিই করুক, ছাড়বে না তো!

এই বাঁধন নেই ব'লেই বেচারী মাসিমা এখনো আশা ছাড়েন নি আমার, বলেন—এ বয়সে পুরুষের অমন হ'য়ে থাকে গো! ও কিছু নয়, শুধু চোখের নেশা, হু'দিনে কেটে যাবে। বিয়ে যে করে নি, এই আমাদের ভাগ্যি।

শুনে আমি নিজের মনেই হাসি। বেশ! যার যা' খুসী বলুক, আমি কিন্তু ও সব বিদ্‌ঘুটে বিধান মেনে চির-সুন্দর, চির-মধুর, শাশ্বত প্রেমকে বিকৃত, বিস্বাদ করতে পারব না, যাতে প্রাণের দাবীর চেয়ে সাত পাকের দাবী বড়—

কথাটা যে শুন্‌বে সেই মনে মনে হাস্‌বে—

—আরে বাপ্‌! ভণ্ডামীতে কাজ কি? আসল কথাই বলো না, ও কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে ধর্ম্মপত্নীত্বে বরণ করতে তুমি কুণ্ঠিত, কিন্তু ভগবান জানেন···

থাক্, নিজের সাফাই করতে চাই না, আমি যা' ভাল বুঝেছি, তাই করেছি, আর ভবিষ্যতে করবও, আমার স্বভাবটাই এমনি একগুঁয়ে। যেটা ধরি, তা' ছাড়ি না।

সকলে যা' করছে আমাকেও তাই করতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেন?

আমি তো জানি, এ পাপাচার নয়, অবৈধ নয়, কিন্তু রজনী—তার মনে যদি এই রকম একটা ভ্রান্ত সংস্কার থাকে···তাই কি?—সে মাঝে মাঝে এমন বিমনা হ'য়ে পড়ে—আমার আকুল প্রাণের ডাকে ওর প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে না—আমার উছ্‌লে-ওঠা বুকের আবেগ থম্‌কে যায় ওর শীতল নিঃশ্বাসে, সেই জন্যেই কি···

কিন্তু আগে তো এমন হ'ত না, রজনী যে সব জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, আমি তো তাকে জোর ক'রে···কি জানি, বড় বিচিত্র এ নারী-চরিত্র !

রজনীর কথা

কি যে হয়েছে, বুঝতে পারি না।

বুকের মধ্যে থেকে থেকে কেমন হু-হু করে, কে যেন চুপি চুপি কানে কানে ব'লে যায়—তোর সুখের স্বপন ফুরিয়েছে, ওরে অভাগী ! আর কেন ? যদি সত্যি সত্যি তাই হয়—এ স্বপন আমার যদি ভেঙেই যায়, উঃ ! না না !

দেবতা আমার ! স্রোতে-ভাসা মালাগাছটী তুলে আদর ক'রে তুমি গলায় পরেছিলে, তাই না তার এ শোভা, এ সার্থকতা ! তোমার সৌন্দর্য্যেই সে যে সুন্দর হয়েছে, হে সুন্দর ! তোমার গৌরবেই তার গরব !

আজ যদি মালার আদর ফুরিয়ে যায়, গলা থেকে খুলে ওকে পায়ের তলায় ফেলে দাও, তবে ওর অনুযোগ বা আপসোস করবার কি আছে ? সে কেন মনে করবে না, এই পায়ের তলায় প'ড়ে থাকাই তার লাঞ্ছিত জীবনের পরম সুখ, চরম সার্থকতা ?

এ 'কেন'র উত্তর আমার সারা অন্তরখানি তন্ন তন্ন করেও পাই

না তো! ভয় হয়, শুধু ভয় হয়, যদি পায়ের তলাতেও স্থান না পাই, যদি, যদি······

নাঃ, মানুষ এমনি করেই পাগল হয় বুঝি?

উনি বলেন—এ তোমার হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ রোজি, এখন থেকে সাবধান হও, মনকে প্রফুল্ল রাখো সর্ব্বদা। যা' তা' ছাই-ভস্ম ভেবে ভেবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত ক'রে লাভটা কি বল তো? ভগবান কোনো দুঃখই তোমাকে দেন নি, তবু দুঃখকে জোর ক'রে খুঁচিয়ে ব'ার করতে চাও কেন?

কথাটা মনে লেগেছিল। সত্যিই তো, আমার কিসের দুঃখ? কি আমি পাই নি?

এত ধন-ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী, আনন্দ-আরামের শত আয়োজন, অমন ইন্দ্রতুল্য স্বামী! আঃ! কি মিষ্টি কথাটী—'স্বামী'! হ্যাঁ, স্বামীই তো! অনাঘ্রাত কুমারী-হৃদয়ের প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে আমি যাঁকে বরণ করেছি, তিনিই আমার স্বামী, জন্ম-জন্মান্তরের!

মন্ত্র প'ড়ে কপালে সিঁদুর ঢেলে দিলেই বুঝি······তবু কেমন যেন আশঙ্কা লেগে থাকে।

ঐ যে চারিদিক্‌কার বিষাক্ত বাতাস, যার ছোঁয়াচ লাগ্‌বার ভয়ে ওঁর সঙ্গে আমার এ নিভৃত নিরাপদ দুর্গের বাইরে যেতে সাহস হয় না।

ওঃ! সে দিন সিনেমায় গিয়ে যা' লজ্জায় পড়েছিলুম, জ্যোতিষবাবুর স্ত্রী যখন আমাকে······কি বল্‌ব? বল্‌তেও যে লজ্জায় ম'রে যাই!

আবার সেই যে পরশু সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে 'লেকে' বেড়াতে গিয়ে—উনি একটু তফাতে ছিলেন, তাই শুন্‌তে পান নি, দু'টী ভদ্রলোক

আমার দিকে ইসারা ক'রে কি বলাবলি করছিলেন — ইনিই বুঝি অমুকবাবুর······

উঃ! কানের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে! মরমে ম'রে গিয়ে বল্লুম—ধরণী, তুমি দ্বিধা হও!

এ সব কথা ওঁর কাছে তুললে কখনো···

—আহা, বল্তে দাও না—গায়ে ফোস্কা পড়ে নি তো!—ব'লে হেসে উড়িয়ে দেন, কখনো বা গম্ভীর মুখে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—তোমার ভালবাসায় এখনো সংশয় আছে রজনী, নইলে এ সব তুচ্ছ কথা তোমার অন্তর স্পর্শ করে কেন? লজ্জা, ভয়, মান-অপমান ত্যাগ করতে না পারলে প্রেমের পূর্ণ পরিণতি হয় না, প্রেমের রাণী রাধা কি কলঙ্কের ভয় রেখে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন?

সত্যই তো।

কি আর বলি? চোখ ফেটে জল এসে পড়ে, মনে হয় বুকখানা একবার দেখাতে পারতুম যদি!

হায়! কেমন ক'রে বলব? কি ক'রে বোঝাব, যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই সংশয়, নইলে কৃষ্ণকে কাছে, অতি কাছে পেয়েও শ্রীমতীর 'হারাই হারাই' ভাব কেন?

পারি না যে, কিছুই বোঝাতে পারি না। নিজের এই অক্ষমতার, অপারগতার দুঃখই আমাকে সব চেয়ে বেশী ব্যথা দেয়। আমার যদি ওঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাই থাকৃত, তা'হলে···

ঐ দেখ, আবার! এ ছাই-ভস্ম ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি ক'রে? যতক্ষণ উনি কাছে থাকেন — বেশ থাকি, চোখের

রাতের ফুল

আড়াল হ'লেই প্রাণে কি রকম একটা ব্যাকুলতা অনুভব করি, এ ব্যাকুলতা যে কিসের…

আচ্ছা, ওঁকে আজকাল এত বেশী অন্যমনস্ক দেখি কেন? কেমন যেন উড়ু-উড়ু ছাড়-ছাড় ভাব, বাড়ী ফিরতে প্রায়ই দেরী হ'য়ে যায়, জিজ্ঞাসা করলে বলেন—কাজ প'ড়ে গেছে।

ভাবি, হবেও বা!

কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি সেই দিন থেকে, যে দিন মাসিমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে উনি গেছ্‌লেন, শান্তার জন্মতিথি উপলক্ষে… উনি তো যেতেই চাইছিলেন না, আমিই জোর ক'রে পাঠালুম। আমার জন্যে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরোধ করা কেন?

ফিরতে ওঁর রাত হ'য়ে গেল।

আমি ওঁর অপেক্ষায় তখনো জেগে—বই প'ড়ে প'ড়ে চোখ দু'টো জ্বালা করছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম — এত দেরী যে? অনেক লোক হয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ—না, অনেক আর কই? বাছা বাছা জনকতক, জ্যোতিষদা'ও ছিলেন—

—ওঁর সঙ্গে মাসিমাদের আলাপ আছে বুঝি?

—বিশেষ নয়, তবে আমার বন্ধু বলেই, হয়তো…

হেসে বল্‌লুম—ইস্! আজকাল ভারি খাতির তো তোমার!

—হুঁ, তুমি এখনো ঘুমোও নি? বারোটা বেজে গেছে যে!

—বাজুক্—ঘুম না এলে করি কি?

রাতের ফুল

উনি আর কিছু না ব'লে, বিছানায় ব'সে জামার বোতাম খুল্‌তে লাগলেন।

সাম্‌নের টেবিল-ল্যাম্পের শুভ্র আলো তাঁর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলুম, মুখে-চোখে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, চম্পক-গৌর কান্তিতে ওঁর মাখন রংয়ের সিল্কের ঢিলা পাঞ্জাবীটা কেমন মানিয়েছে! সিঁথির সূক্ষ্ম রেখায় দু'ভাগ করা থোকো থোকো ঢেউ-খেলানো চুলগুলি কপালের দু'পাশে এসে পড়েছে, কি মধুর অলসভাবে! এঁর কাছে আমি!···

রবিবাবুর সেই লাইনটা মনে প'ড়ে গেল—

পূজার তরে হিয়া উঠে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে বলো কি দিয়ে?

—এখনো ব'সে আছ? শুয়ে পড়ো না—

চকিত হ'য়ে মুগ্ধ চোখ দু'টীকে ওঁর মুখের উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে বল্লুম—তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, এক গেলাস জল—থাক্‌, আমি নিচ্ছি।

জল খেয়ে কাপড় ছেড়ে উনি আবার বিছানার কাছে এলেন, কিন্তু শুলেন না।

—তুমি শোও রজনী! আমি একটু পরে···গোলমালে ঘুমটা চটে গেছে কি না!

আলোটা সরিয়ে রেখে উনি ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগ্‌লেন, বল্‌লেন—গরম বোধ হ'চ্ছে, না? ফ্যান্‌টা খুলে দেব? তোমার লাগে যদি···থাক্‌।

রাতের ফুল

গরম কই? শিয়রের জানালা দু'টো খোলা, ফাগুন রাতের ফুলের গন্ধে আকুল স্নিগ্ধ মধুর বাতাস ঝির্-ঝির্ ক'রে এসে গায়ে লাগ্‌ছিল। বল্লুম—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না, ফ্যান্ খুলে দিচ্ছি—

—থাক্ না, তুমি শোও, দরকার হ'লে আমিই...

আজ এমন উন্মনা ভাব কেন? মাসিমা কিছু বলেছেন না কি? কিন্তু উনি তো গ্রাহ্য করেন না কারো কথা।

একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লুম। খানিক এদিক্-সেদিক্ ঘুরে মিনিট কতক টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে উনি জানালার কাছে গিয়ে বস্‌লেন।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছি, একটু যেন তন্দ্রার আবেশ এসেছে, শুন্‌তে পেলাম উনি গান করছেন গুন্ গুন্ ক'রে—

তোমার ও সুন্দর মুখপানে চাহিয়া থাকিতে
শুধু ভালবাসে এই আঁখি,
তাই অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া
আমি অবাক্ হইয়া থাকি!

বাঃ! বেশ গানখানি তো! ওঁর মিষ্টি গলায় আরো মধুর লাগ্‌ছিল। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার তন্দ্রার ভাবটুকু কেটে গেল, চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌ল।

অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া
অবাক্ হইয়া থাকি!

এ গান যে আমারই প্রাণের অনুভূতি দিয়ে রচনা করা! মাঝখানে থাম্‌তে দেখে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্লুম—তারপর?

—তারপর? আর মনে পড়ছে না যে। তুমি এখনো জেগে না কি? আমি ভেবেছি ঘুমিয়েছ।

উনি এসে আমার পাশে বসলেন। আমার গায়ে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—তুমি এস্রাজ্ শিখবে রোজি? মেয়েদের হাতে ওটা ভারী মিষ্টি লাগে।

—আজ মাসিমাদের ওখানে শুনেছ বুঝি? কে বাজাচ্ছিল?

—অজিতার এক বন্ধু, চমৎকার হাত মেয়েটীর, তেমনি বাঁশীর মত গলা।

—দেখ্‌তেও খুব সুন্দর বোধ হয়।

উনি যেন থম্‌কে গিয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ক'রে জানলে?

—যে অমন সুন্দর গাইতে-বাজাতে পারে—

—তাকে সুন্দর হ'তেই হবে, কেমন? বাহবা! শুধু কল্পনাই নয়, তোমার অনুমান-শক্তিও খুব প্রখর রোজি!

উনি হেসে উঠ্‌লেন।

আমি থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলুম। কিন্তু হায় রে কৌতূহল! খানিক পরে উনি শুয়েছেন দেখেও আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম—সে মেয়েটীর বিয়ে হয় নি বুঝি?

—আমি কি তা' জিজ্ঞাসা করতে গেছি? কি মুস্কিল! মেয়েটী ভাল গান-বাজ্‌না জানে, এইটুকু বলেছি, ব্যস্, আর কোথায় আছে! মেয়েদের কেমন যে স্বভাব!

ওঁর কথার ভঙ্গীতে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট।

রাতের ফুল

—আর নয়, ঘুমিয়ে পড়ো এবার।—

ব'লে উনি পাশ ফিরে শুলেন।

এমন লজ্জা হ'ল! ছি! ছি! কেন যে মরতে······

কিন্তু এই দু'টী সহজ তুচ্ছ প্রশ্নে এতখানি বিরক্তির কি হেতু ছিল, তা' বুঝ্‌তে পারলুম না।

সেই—সেই দিন থেকেই ওঁর প্রকৃতিতে কেমন একটু পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছি, হ'তে পারে এ আমার মনের ভ্রান্তি।

কিন্তু শুধু তাই নয়, আরো কত খুঁটিনাটি······

আগে আমাকে বাইরে বা'র করবার জন্মে উনি কি রকম পীড়াপীড়ি করতেন, কোনোদিন থিয়েটার, কোনোদিন বায়োস্কোপ, কোনোদিন কিছু, আজকাল সেদিকেও আর উৎসাহ দেখি না তেমন। এই গেল শনিবারেই তো আমায় ব'লে গেলেন তৈরী হ'য়ে থাকতে, 'চিত্রা'য় কি একটা ভাল নূতন ফিল্‌ম দিয়েছে, যেতেই হবে।

ও মা! সেজে-গুজে ব'সে রইলুম, এলেন রাত দশটার পর! হঠাৎ কি একটা জরুরী কাজ প'ড়ে গিয়েছিল না কি!

কিন্তু বিশুর মা ড্রাইভারের মুখে শুনেছে, বাবু সিনেমাতেই গেছ্‌লেন। একলা কি দোকলা, তা' আর জিজ্ঞাসা করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না।

ওঁকে সেই কথার একটু আভাস দিয়েছিলুম, তাতেই সোফার বেচারা ধমক খেয়ে ম'ল।

যাক্ গে, আর বেশী কিছু জেনে দরকার নেই আমার!

কেঁচো খুঁড়তে শেষে সাপ বেরিয়ে পড়ে যদি······গোবিন্দলালের

ভ্রমরের মত যদি আমারও কপালে······আহা! বেচারী ভ্রমর! সে দিন বায়োস্কোপে ভ্রমরের দুঃখের চিত্র দেখে কেঁদে বাঁচি নে! উনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন—বাস্তবিক কি 'সেন্টিমেণ্টাল্‌' তোমরা?

হায়! ভ্রমর স্বামীর 'পরে রাগ-অভিমান করেছিল যে অধিকারে, সে অধিকার আমার কোথায়?

আমি ওঁকে আজ কিসের জোরে······

দূর করো ছাই! কেবল ঐ চিন্তা। কেন? ভালবাসার কি কোনো দাবী নেই? ওঁর ভালবাসাই তো আমাকে রাজরাণী করেছে, নইলে এই যে হীরার হার, মোতির মালা—এগুলোর দাম কি?

কিচ্ছু না! সেই ভালবাসাতেই যদি বঞ্চিত হ'তে হয়, তা'হ'লে······ ওঁর কাছে আমি শুধু দয়া ভিন্ন আর কিসের প্রত্যাশা······না না, অমন ক'রে শুধু দয়ার পাত্রী হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে আমি চাই না, চাই না গো! ওঃ! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমায় মৃত্যু দিও, হে ভগবান্‌!

জ্যোতিষের কথা

গতিক ভাল নয় দেখ্‌ছি।

ব্যাপারটা যে শেষকালে এই রকম দাঁড়াবে, আগেই তা ভেবেছিলুম্‌, তবে এত শীগ্‌গির আশা করি নি। এ যে একেবারে উপন্যাসের নায়কের মত, প্রথম সাক্ষাতেই ভায়া আমার যাকে বলে 'লাভড্‌' বনে গেল!

এর মধ্যে ওর মাসিমার হাত আছে নিশ্চয়, নইলে বেছে বেছে পবিত্রর সঙ্গেই মিস্ ব্যানার্জ্জীর অত ঘটা ক'রে আলাপ করানো কেন? আমার মনে হয়, সেদিনকার পার্টিটা শুধু এই উদ্দেশ্যেই…… যাক্—

'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে' দরকার কি? বন্ধু ব'লে মানে, আমাকেও ওর ভাল-মন্দ দেখতে হয়, দরকার বুঝলে মুখ ফুটে দু'কথা বলতেও হয়।

তা' এর মধ্যে কিছু বলবার মত সময়ও তো পাচ্ছি নে ছাই! আফিসে কাজের এত ভিড়, পবিত্র আগে প্রায়ই আসত, এখন কখনো কচিৎ।

শুভা সে জন্যে অনুযোগ করলে যা' হোক একটা বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু আমার কাছে তো লুকোবার উপায় নেই!

একাধিক বার ইসারায় ওকে সতর্ক করেও দিয়েছি, মানে, এ তো আর রজনী নয়, ধনীর দুলালী এবং বিদুষী মহিলা, এঁর দিকে একটু বুঝে সুঝে……

কিন্তু, এখন কে রোধে তাহার গতি?

এই উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তাই চুপ ক'রে ছিলুম, শুভাকেও কিছু বলি নি। কিন্তু শুভা যখন উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললে—পবিত্র ঠাকুরপো'র হ'ল কি গো? আজ তো রবিবার, ছুটী আছে, একবারটী খোঁজ নাও না, কদ্দিন আসেন নি, বেচারার অসুখ-বিসুখ হ'য়ে থাকে যদি…

তখন আমি আর থাক্তে না পেরে বল্লুম—না, বেচারা ভালই

আছে শুভা! এই তো সেদিন পার্কে দেখা হ'ল, সে এখন ভারি ব্যস্ত—

—কিসে ব্যস্ত? পূর্ব্বরাগের জের এখনো চলছে বুঝি? রজনীকে চোখের আড়াল ক'রে……

—রজনীর এখন মাথুরের পালা! পূর্ব্বরাগ চলেছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে।

—সে কি গো?

শুভা সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ল—এর মধ্যে চন্দ্রাবলী জুট্‌ল আবার কোথা থেকে? কে তিনি?

—তিনি মিস্ লিলি ব্যানার্জ্জী, ব্যারিষ্টার-দুহিতা, রূপসী, বিদুষী, সুগায়িকা, যাকে বলে আপ্-টু-ডেট্ আর কি?—যোগাযোগ ভালই হয়েছে, ঐ রকম স্ত্রীই পবিত্রের হওয়া উচিত, কিন্তু গোল বাধছে রজনীকে নিয়ে। ও হতভাগা মেয়েটার ভাগ্যে কি জানি……

শুভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—সত্যি ভারি দুঃখ হয় ওর জন্যে, কি অভিশাপ নিয়েই ও জগতে এসেছিল! আচ্ছা, সেই মেয়েটি, কি নাম বল্‌লে—লিলি? সে কি রজনীর চেয়ে সুন্দরী?

—তা' কি ক'রে বলব? সৌন্দর্য্য নিজের নিজের চোখে, একজন আর্টিষ্টের চোখে লিলির চেয়ে রজনীকে সুন্দর লাগবে হয়তো—

—তবে? তোমার বন্ধুটী ওদিকে ঝুঁক্‌ছেন যে? নতুনত্বের নেশা? সত্যি! পুরুষের মন কি চঞ্চল বাপু! এদ্দিন একেবারে রজনী বল্‌তে অজ্ঞান, সেই রজনী এখন……

—শুধু নতুনত্বের নেশাই নয় শুভা, নারী-সৌন্দর্য্যের যে জিনিসটী

পুরুষের মনকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতে পারে, তোমার রজনীতে তা' নেই।

—সেটা কি শুনি?

—যৌবনের চাপল্য, উচ্ছ্বলতা, যা' নারীর হাব-ভাবে, ঠোঁটের হাসিতে, চোখের চাহনিতে, মুখের বাণীতে মাদকতার সৃষ্টি ক'রে পুরুষের চোখে তাকে লোভনীয় ক'রে তোলে—তাতে আবার মার্জ্জিত রুচি, পালিশ করা······

—ব্যস্ ব্যস্! এতও জানো তুমি! তা' এখন সেই মার্জ্জিত রুচিকে নিয়েই তোমার বন্ধু বুঝি···

—একেবারে মসগুল্! হাবু-ডুবু খাচ্ছেন আর কি!

—আর বেচারী রজনীকেও নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছেন! সত্যি, কি অন্যায় বলো দেখি? একটা মেয়ের জীবন এ ভাবে নষ্ট করা যে কত বড় পাপ—

—তোমার ও পাপ-পুণ্যের ধার ওরা ধারে না শুভা, ন্যায়-অন্যায়ও বোঝে না। বড় লোকের ছেলে, মাথার উপর কেউ নেই, নিজের খেয়ালে চলে, বাঁধন-হারা জীব—

—বাঁধন দিতে হবে, জোর ক'রে—

—সেই চেষ্টাই তো করা হ'চ্ছে, পবিত্রের মাসিমা সেই ব্যবস্থা করবার জন্যেই এবার লিলিকে নিয়ে···

—ও! এ মাসিমার ফন্দী বুঝি? তবে আর···

শুভা মুখখানি ম্লান ক'রে উদাস সুরে বল্লে, তা'হলে কি করা যায়? ও অভাগী মেয়েটার যে এখন গলায় দড়ী ভিন্ন আর উপায় নেই!

—সে জন্যে দুঃখ ক'রে আর কি হবে বলো ? ও যে নিজের হাতেই গলায় ফাঁস পরেছে। রজনী একটু শক্ত হ'লে হয়তো ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। যাক্, এমনই কি হয়েছে ? এক পাশে ও পড়ে থাকবে 'খন, সেকালের রূপকথার দুয়োরাণী হ'য়ে, ওটা তো বড়মানুষী চালের একটা অঙ্গ।

—পোড়া কপাল অমন বড়মানুষী চালের ! একটা গরীব মেয়ের সর্ব্বনাশ ক'রে···নাঃ, এর একটা প্রতিকার না করলে······

—প্রতিকার করবে কে ? তুমি না আমি ? হুঁ ! নিজের অধিকারের বাইরে যেতে নেই শুভা ! তা' হ'লে এতদিনকার বন্ধুত্ব আমাদের মাটি হ'য়ে যাবে। উচিত বল্‌লে বন্ধু বিগ্‌ড়োয়, জান তো ?

—তাই ব'লে চোখের সামনে এত বড় একটা অন্যায় হ'চ্ছে—দেখেও চুপ ক'রে থাকবে ?

—নেহাৎ চুপ ক'রে আমি নেই, চেষ্টা ক'রে দেখছি, বন্ধুত্বের জোরে যতদূর হ'তে পারে।

মনে একটা অভিমান এসে পড়েছিল, যাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসি, স্নেহ করি, তার কাছে উপযাচক হয়ে যেতে হবে ? কিন্তু যেতেই হ'ল শ্রীমতীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে।

আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, গুলি ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তেই দেখি, মোটর বাইকের বিকট হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক নিনাদিত ক'রে পবিত্র—

আমাকে দেখেই সে — হাঁকলো ! জ্যোতিষদা' যে !— ব'লে

বাহনের গতি স্থগিত ক'রে নেমে পড়ল — বল্লে, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম জ্যোতিষদা' !

—কেন ? হঠাৎ এ দুর্ম্মতি হ'ল যে ?

—হ্যাঁ, রাগ তো হবারই কথা—কদ্দিন আসতে পারি নি—

পবিত্র সহাস্যে আমার হাত ধ'রে বল্লে—কি করি ভাই ? এমন ঝামেলায় প'ড়ে গেছি······

—তা' আর আমায় বলতে হবে না বন্ধু ! তোমার চেহারাতেই বোঝা যাচ্ছে। আশীর্ব্বাদ করি এমনি ঝামেলায় যেন জন্ম জন্ম তুমি······

—ঠাট্টা না দাদা, বাস্তবিক, ভারি মুস্কিলে পড়েছি আমি, তাই তো ছুটে এলুম তোমার অভয় চরণে শরণ নিতে।

—ভাল ভাল ! দয়া ক'রে এসেছই যদি, তবে দীনের কুটীরে একবার পদার্পণ······তোমার বউদি' 'ঠাকুর পো, ঠাকুর পো' ক'রে একেবারে অস্থির, বলে, একবারটি খোঁজও নাও না, এ তোমাদের কি রকম বন্ধুত্ব ?

—তা' আমি জানি, বউদি' আমাকে যে রকম স্নেহ করেন—

পবিত্র গলার স্বর খাটো ক'রে সলজ্জভাবে বল্লে — বউদি' শুনেছেন না কি ? লিলির কথা বলেছ ? তা' হ'লে আর শর্ম্মা ওদিকে ঘেঁস্‌ছেন না !

—কেন বলো দেখি ? পরাজয়ের লজ্জা ? তাতে আর হয়েছে কি ! তোমাকে একবারটি যেতেই হবে ভাই, ও ভারি উৎকণ্ঠিত হয়েছে তোমার জন্যে।

পবিত্র খানিক নির্ব্বাক থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—আজ নয়, আর একদিন যাব, বউদি'কে ব'লো, আমায় ক্ষমা করেন যেন, আর তুমিও—তুমিও আমাকে মাপ ক'রো জ্যোতিষদা'!

পবিত্রের কণ্ঠস্বর গাঢ়, চোখ যেন ছল-ছল করছে, ব্যাপার কি?

আমার রাগ-অভিমান সব উড়ে গেল। বল্লুম—ক্ষমা চাইবার দরকার নেই ভাই! তবে তোমার যাতে ভাল হয় তাই ক'রো, আমরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী! হঠাৎ না বুঝে-সুঝে ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু ক'রে ফেল্‌লে সেটা পরে দুঃখের কারণ হ'তে পারে।

—তাই তো ভাবছি। এ ধারে এসো জ্যোতিষদা'!

রাস্তার যে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, সেইখানে এসে পবিত্র মিনতির সঙ্গে বল্‌লে—জ্যোতিষদা', আমার একটি অনুরোধ রাখবে তুমি?

—কি অনুরোধ ভাই, অত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? আমাকে তোমার জন্যে কি করতে হবে বলো।

—তোমার সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জী একবার দেখা করতে চান।

মিঃ ব্যানার্জ্জী? লিলির বাবা? তাঁর সঙ্গে আমার কতটুকুই বা পরিচয়? সেদিনকার পার্টিতে যা দু'-একটি কথা হয়েছিল, তা' শুধু পবিত্রর বন্ধু ব'লে। তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করলেন কেন?

আমি বিস্মিত হ'য়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কেন বলো দেখি, হঠাৎ এ গরীবের উপর অনুগ্রহ হ'ল কেন? না ভাই, ও-সব সাহেবী মেজাজের লোককে আমার বড় ভয় করে—

রাতের ফুল

—'না' বল্‌লে ছাড়ব না জ্যোতিষদা', তোমাকে তাঁর কাছে একবার যেতেই হবে, অন্ততঃ আমার অনুরোধ রাখতে, নিতান্ত দরকার বলেই তোমায় কষ্ট দিচ্ছি। বলো, যাবে?

—পবিত্রর ব্যগ্রতা দেখে আর 'না' বল্‌তে পারলুম না, বল্‌লুম বেশ, কবে যেতে হবে?

—আজই, এখনি চলো না আমার সঙ্গে।

—এখনি?

—হ্যাঁ, তোমার কোনো কাজ আছে না কি?

—না, তোমার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম, আচ্ছা, চলো তা'হলে।

—এসো, এই বাইকেই, হ্যাঁ, যাবার আগে একটা কথা ব'লে রাখছি জ্যোতিষদা', আমি মিঃ ব্যানার্জ্জীকে রজনীর কথা বলি নি এ পর্য্যন্ত, শুধু বলেছি জীবনে আমার এমন একটা 'সিক্রেট' আছে, যে জন্যে দিনকতক ভাববার সময় চাই। উনি শীগ্‌গির পাকাপাকি ক'রে ফেলতে চান কি না, তোমাকে সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করবেন বোধ হয়।

—তা'হলে কি সত্যি সত্যি তুমি মিস্ ব্যানার্জ্জীকে···কিন্তু এবার বিয়ে তো? না, তোমার সেই চির-মধুর বাঁধন-হারা স্বাধীন প্রেম?

—আর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই, আমি কি যে করব, কি না করব, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না, আমার বর্ত্তমান অবস্থা কেমন জানো? কর্ণধারহীন নৌকোর মত টলমল করছে, একবার এদিক, একবার ওদিক। বাস্তবিক, এ দোটানায় প'ড়ে প্রাণান্ত হবার যোগাড়—

—বুঝেছি, তোমার এখন হয়েছে 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি!' কিন্তু এমন ভাবে দু'নৌকোয় পা দিয়ে থাকা বেশী দিন তো চল্‌বে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যদি রজনী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তা'হলে কি বলব? আমার তো মনে হয়, তুমি না ভাঙ্গলেও উনি সব জেনে গেছেন। এ রকম কথা কি চাপা থাকে?

পবিত্র গম্ভীরমুখে একটুখানি ভেবে বল্‌লে—তা' হ'লে যা' সত্যি তাই ব'লে দিও, লুকোবার দরকার নেই। ব'লো, এ দুর্ব্বলতা যদি ঝেড়ে ফেলতে পারি তবেই···নইলে তাঁর মেয়ের আশা আমি ছেড়ে দেব, তাতে আমার যত কষ্টই হোক, প্রতারণা আমি করব না—

শেষের দিক্‌টা পবিত্রর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। নাঃ, এ যে একেবারে রীতিমত নভেল! পবিত্র তার সমস্যাটা এবার যথার্থই জটিল ক'রে তুলেচে দেখছি, এ সমস্যার সমাধান করা কি আমার কর্ম্ম? দেখি, ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু কুলোয়।

সাহেবী মেজাজের হ'লেও মিঃ ব্যানার্জ্জী লোকটা মন্দ নয় দেখলুম। পবিত্রর সেই 'সিক্‌রেট' জানতেই আমার তলব পড়েছে বটে। তাঁর কন্যার জন্য নির্ব্বাচিত বর এখন সাগরপারে শিক্ষার্থী, কিন্তু পবিত্রকে দেখে তাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়েছে,—লিলিও পবিত্রর অনুরাগিণী। মাতৃহীনা মেয়েটীকে অসুখী করতে তিনি চান না, কিন্তু পবিত্রর এই 'দো-মনা' ভাব তাঁকে অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না, সুতরাং······

ভদ্রলোক বস্তুতঃই বড় উদ্বিগ্ন হয়েছেন, দেখলুম। রজনীসংক্রান্ত

ব্যাপারটা তাঁর অজ্ঞাত নেই। পবিত্র যা' বলেছিল, আমি তাই ব'লে আশ্বাস দিলুম তাঁকে, অর্থাৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার জন্যে আপাততঃ পবিত্রকে কিছু সময় দেওয়া হোক্, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে, ইত্যাদি—

যাক্ আমি তো ব'লে খালাস, এখন বিধির নির্ব্বন্ধ!

পবিত্রর কথা

কি আর বলব?

কোথা হ'তে কি যে হ'য়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মনে হ'চ্ছে—এ যেন ইন্দ্রজালের মায়া!

মানুষের মন কি এতই চঞ্চল? এমন পরিবর্ত্তনশীল?

আশ্চর্য্য!

আমার নয়নের মণি, অন্তরের ধন রজনীকে অন্তর ক'রে দিতে চায়, কে এ মায়াবিনী নারী!

যার সম্মোহিনী শক্তির প্রেরণায় আমার প্রসুপ্ত যৌবন পলকে জাগ্রত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে দুর্ব্বার নদের মতো ছুটে চলেছে! ওঃ! এত বড় কামনা এতদিন লুকিয়েছিল কোথায়?

আজ আমার বুকের মধ্যে মাথা তুলে উঠ্‌ছে এ কি ব্যাকুল প্রমত্ত

আকাঙ্ক্ষা? এর পরিতৃপ্তি বা নিবৃত্তি না হ'লে আমার বেঁচে থাকাই ভার!

কিন্তু·········নিবৃত্তির জন্যে চাই সংযম, পরিতৃপ্তির জন্যে চাই সাধনা—দুই-ই কঠিন। আমার মতো দুর্ব্বল···

হ্যাঁ, দুর্ব্বল বই কি? এতদিন আমার চিত্তের দৃঢ়তায় অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস এবার ভেঙ্গে গেছে! সেই জন্যেই নিজেও কষ্ট পাচ্ছি, অন্যকেও দিচ্ছি। যদি আজ লিলিকে একবার মুখ ফুটে বল্‌তে পারতুম—! কিন্তু তাই কি বলা যায়? নিজের এত বড় একটা দুর্ব্বলতা, যে নারীকে আমি শুধু ভালবাসি নয়, সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা করি, তার কাছে···ছিঃ!

কথাটা শুনে সে যদি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদি আমাকে ক্ষমা করতে না পারে, তা' হ'লে······না, অত সাহস আমার নেই। কিন্তু না জানিয়েই বা উপায় কি? এমন ভাবে দু'নৌকোয় পা দেওয়া কতদিন চলবে?

মিঃ ব্যানার্জ্জী তো অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, হবারই কথা। ওই মা-হারা মেয়েটাই যে তাঁর শেষ জীবনের সম্বল, ওকে সুখী করবার জন্যে ভদ্রলোক সবই করতে পারেন, তাই না, সব জেনেও আমার আশা ছাড়তে পারছেন না।

উনি না কি জ্যোতিষদা'কে মিনতি ক'রে বলেছেন, আমি যেন অচিরে এ ছেলেমানুষী ছেড়ে দিয়ে, মন স্থির ক'রে লিলিকে সুখী করতে চেষ্টা করি। পুরুষ-চরিত্রে অমন দুর্ব্বলতা ঘটেই থাকে, তাতে আর হয়েছে কি? রজনীর একটা ভাল মতো ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে······ মানে, অশন-বসনের অভাব যা'তে তার না হয়······

হায় রে! তাতেই কি ওর জীবনের ক্ষতি সব পূর্ণ করা হবে? রজনীর প্রতি আমার সকল কর্ত্তব্যের শেষ হ'য়ে যাবে? তা' হ'লেই কি—

যাকে এতদিন সর্ব্বেশ্বরী ক'রে রেখেছিলুম, সে এখন বেঁচে থাকবে শুধু আমার করুণার উপর নির্ভর ক'রে? আঃ! কথাটা মনে আনতেও প্রাণে ব্যথা বাজে যে!

আচ্ছা, লোকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানেও আবার বিবাহ করে তো? আমি যদি রজনীকে পৃথক রেখে······কি পাগল! লিলি তাতে রাজী হবে কেন? কোন্ নারীই বা তা' পারে? এ তো সে সতী-সাবিত্রীর যুগ নয়! আর লিলির পিতা, তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর কন্যাকে পেতে হ'লে রজনীর সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখা চল্‌বে না, ওই ভরণ-পোষণ পর্য্যন্ত, তা'ও দূরে থেকে, কাজেই·········

একজনের আশা ছাড়তেই হয়, কিন্তু কা'র? লিলির?

বুকের ভিতরে সজোরে ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল, আমার চোখের সাম্‌নে লিলিকে আর একজন এসে·········

না—সে আমি প্রাণ থাকতে পারব না। এত মনের বল নেই আমার। তার চেয়ে·········

কি যে করি ভেবেই পাই নে, ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ছি—এই দো-টানার স্রোতে প'ড়ে।

রজনী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে যেন, বল্‌লে হেসে উড়িয়ে দেয়,

কিন্তু হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দু'টী ছল্‌ছলিয়ে আসে, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি।

সে দিন জোর ক'রে ডাক্তার ডেকে দেখালুম। ডাক্তার বল্‌লেন—শরীরে রক্তাভাব, হার্টের দুর্ব্বলতাই তার কারণ, এর সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা — চিত্ত প্রফুল্ল রাখা। সম্ভবতঃ মনের অসুখ থেকেই এ রোগের উৎপত্তি হয়েছে।

শুনে মনটা যেন ছাঁৎ ক'রে উঠল। রজনী টের পেয়েছে না কি? লিলির প্রতি আমার আসক্তি……কিন্তু কেমন ক'রে জানবে?

বাড়ীর ঝি-চাকরদের এত বড় সাহস হবে না, সোফার ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে দিয়েছি। পাড়া-প্রতিবাসী এ দিকে কেউ ঘেঁস্‌ দেয় না, তবে?…

মেয়ে মানুষের মন কি অন্তর্য্যামী!

সে দিন লিলির কাছে যাবার জন্যে বেরিয়ে আবার ফিরে এলুম, মন শক্ত ক'রে দু'-একদিন না গিয়ে দেখিই না!

রজনী জানালায় ব'সে বই পড়ছিল নিবিষ্ট হ'য়ে।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করেছে—হাল্‌কা মেঘ। তার ছায়ায় গোধূলির আলো ম্লান হ'য়ে রজনীর মুখে চোখে পড়েছে। ওর স্বভাব-শুভ্র বর্ণ আজ আরো পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, যেন বাদল-সাঁজে ফোটা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা! তেমনি উদাস, সুন্দর, তেমনি করুণ!

বল্‌লুম—রোজি! তোমার নাম 'রজনীগন্ধা' হ'লেই ঠিক মানাত, এবার থেকে আমি তাই বল্‌ব।

রাতের ফুল

রজনী সচকিতে বই থেকে মুখ তুলে বল্‌লে—বেশ! যা' খুশী তাই ব'লো, কিন্তু···নাম বদলালেই মানুষ বদলায় না তো!

তার ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি, সে হাসিটুকুর আড়ালে ব্যথা প্রচ্ছন্ন ছিল কি?

জানালার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বল্‌লুম—কই? তোমার এস্রাজ শেখা কতদূর হ'ল, আমাকে একদিনও শোনালে না?

—শোনাবার মতো হ'লে তো! ভালই লাগে না, কি করি।

—ভাল যে লাগাতেই হবে রোজি! মন ভাল রাখবার জন্যে গান-বাজনার মতো জিনিস আর নেই। ডাক্তার বল্‌ছিলেন······

—ছাই জানে ডাক্তার! বারণ করি, তবু শুনবে না, আমার হয়েছে কি? কিচ্ছু না!

—তা' হ'লে রোগা হ'য়ে যাচ্ছ কেন? — দেখ দেখি হাতের চুড়ীগুলো কত ঢিলে হ'য়ে গেছে!

—ও তো অমনিই ছিল। তুমি আজ যে যাও নি?

চম্‌কে বল্‌লুম — কোথায়?

—যেখানে রোজ যাও, বেড়াতে!

—নাঃ, একদিন না-ই বা গেলুম।

—না গেলে কষ্ট হবে না? অভ্যাস যখন······

বল্‌তে বল্‌তে রজনী আমার মুখের পানে তাকালে, তার স্নিগ্ধ অলস চোখে অমন অতলস্পর্শী দৃষ্টি আমি কখনো দেখি নি, সে দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ ক'রে মনের প্রচ্ছন্ন কামনা, গোপনতম ভাব বুঝে ফেলতে চায়!

আমি থতমত খেয়ে গেলুম যেন। সে ভাব গোপন করতেই আমি

বললুম, এমনই কি অভ্যাস!—এ বইখানা তোমার বড় ভাল লাগে দেখছি।—ব'লে রজনীর কোলের উপর খুলে-রাখা 'চয়নিকা'খানা তুলে নিলুম। সামনের পাতায় 'নারীর উক্তি' কবিতা, এখন সেটাই রজনী পড়ছিল বোধ হয়।

"আমি কি চেয়েছি পায়ে ধ'রে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চ'লে যাওয়া?
কেন আন' বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?"

আবার—

"বুক-ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পারো না?
তর্কেতে বুঝিবে তা' কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!"

কবিতাটীর এই রকম কয়েক জায়গায় পেন্সিলের দাগ দেওয়া, এ হ'তে পাঠিকার মনের ভাব কি বোঝায়?

মনটা আমার অনুশোচনার তীব্র গ্লানিতে ভ'রে গেল। ভগবান্ এ কি বিষম সমস্যায় ফেললেন আমাকে? আমি এখন কি করি?

রাতের ফুল

মুখে যেন আর কথা আসছিল না, রজনীর দিকে চাইতেও আর ভরসা হ'ল না। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে বইয়ের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললুম—চল না, আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক্— অনেকদিন তো বেরোও নি, যাবে ?—

রজনী এত সহজে রাজী হবে আশা করি নি, আশ্চর্য্য! তার এই সম্মতিতে আমার মনে আনন্দ তো হ'লই না, বরং কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলুম যেন। মনে হ'চ্ছিল লিলি কি ভাবছে ?— কি বিপদ !

·

থিয়েটার থেকে ফিরে ঘুমোতে পারি নি অনেকক্ষণ, কাজেই উঠতে বেলা হ'য়ে গেল। মানুষ দুঃস্বপ্ন থেকে জাগলে যেমন হয়, আমার মনের অবস্থা তখন তেমনি।

অপ্রসন্ন ভারাক্রান্ত চিত্তে প্রাতঃরাশ শেষ ক'রে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসলুম।

কাল যদি একটু বুদ্ধি ক'রে দু'-ছত্র লিখে পাঠাতুম সোফারের হাতে—ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্য নয়, ভদ্রতার অনুরোধে শুধু—

আজও যদি যেতে না পারি ?—

থাক্, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

অস্থিরভাবে টেবিলের উপরকার কাগজ-পত্রগুলো নাড়া-চাড়া করছিলুম, সহসা দৃষ্টি পড়ল 'পেপার-ওয়েটে'র নীচে চাপা একখানা নীল রংয়ের খামের উপর। ও কার চিঠি ? ডাকের সময় তো এখনো হয় নি !

তাড়াতাড়ি তুলে দেখি মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা। ক্ষিপ্র হস্তে খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বা'র করলুম, তাতে লেখা রয়েছে—

মিষ্টার মুখার্জী,

কাল আপনি এলেন না কেন? কত রাত পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা করেছি।

আজ আসবেন তো? নিশ্চয় আসবেন। নমস্কার।

ইতি—

লিলি

মাত্র এই দু'টী লাইন, কিন্তু লিলির লেখা তো? সে চিঠির স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

—লিলি, লিলি!—আমার সোনার লিলি!

কাল সে কত না আগ্রহে, কত না আশায় আমার পথ চেয়ে বসেছিল, সে জন্যে নিরাশ হ'য়ে কি ব্যথা, কি ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা আমারই মতো রাত জেগে……আঃ! আমার শিরায় শিরায় পুলকের তড়িৎ শিহরণ খেলে গেল, চিঠিখানা আর একবার পড়তে গিয়ে মনে হ'ল, এ তো ডাকে আসে নি, তবে কে দিয়ে গেল? কা'র হাতেই বা…বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, বল্‌লে, ব্যারিষ্টার সাহেবের 'বয়' খুব সকালেই সাইকেল ক'রে এসে দিয়ে গিয়েছে। ব'লে গেল, এ চিঠি যেন আপনি ছাড়া আর কারো হাতে না দেওয়া হয়।

অধৈর্য্য হ'য়ে বললুম—তখুনি আমায় দিস্ নি কেন?

—কি ক'রে দিই হুজুর? তখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।

—তার পরে, আমি উঠেছি তো অনেকক্ষণ।

বেয়ারা গলার স্বর খাটো ক'রে, মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বল্‌লে—হুজুরকে একলা পাই নি যে—

ছোঁড়ার বুদ্ধি আছে দেখছি! তাকে বিদায় দিয়ে, আর একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিখানা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলুম।

এমন ভাবে লুকোচুরী করা কতদিন চল্‌বে? এই লিলিকে আমার আপন, একান্ত আপন ক'রে পাব আর কতদিনে। আমাদের মাঝখানে ব্যবধান রচনা ক'রে যে দু'জনকে তফাৎ ক'রে রেখেছে, তার প্রতি মন আমার বিরাগে ভ'রে উঠল।

তখন রজনীর অস্তিত্বও আমার অসহ্য লাগছিল যেন। ওর জন্যেই তো কাল যেতে পারলুম না। আবার আজও যদি না পারি···নাঃ, আমি যাবই, এখনি যাব, পুরুষের মনে যদি এতটুকু দৃঢ়তা না থাকে, তবে আর······

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠতেই দরজার পর্দা ন'ড়ে উঠল, রজনী না কি? না, বিশুর মা।

বিশুর মা উদ্বিগ্ন ভাবে বল্‌লে—বাবু, একবার ভেতরে আসুন তো! বউরাণীর শরীর যেন কেমন করতে লেগেছে!

— কি হ'ল আবার? এই তো বেশ ভালই ছিল।

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে শয়নকক্ষে গিয়ে দেখি — রজনী বুকে বালিশ

চেপে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। বিবর্ণ মুখে তার যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট!

আমার পদশব্দে সে চমকিত হ'য়ে চোখ খুলে বল্‌লে—আঃ! বিশুর মা'কে নিয়ে আর পারি নে! এত ক'রে বারণ ক'রে দিলুম, তবু···কি দরকার ছিল সাত-তাড়াতাড়ি ডেকে আনবার!

তার ক্লিষ্ট স্বরে বিরক্তি নয়, ব্যথার আভাস। হায় অভিমানিনী! এ অভিমান যে তোমার···

মনটা মমতায় ভিজে গেল। ওই তো দোষ, রজনীকে দেখলেই আমার সব দৃঢ়তা ভেসে যায়। তারপর ওর এই অবস্থা হয়তো আমারি জন্যে!

পাশে ব'সে প'ড়ে অধীর আগ্রহে বল্‌লুম—কি হয়েছে রজনী? অমন ক'রে······

—কিছু না, বুকে কেমন ব্যথা লাগছে—

—কেন বলো দেখি? জ্বর-টর হয় নি তো?

গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, সহজের চেয়েও ঠাণ্ডা যেন। বল্‌লুম—কখন থেকে টের পেলে? ফিক্ ব্যথা না কি?

—কি জানি, বুঝতে পারছি নে। রাত্তিরে তো ভালই ছিলুম, সকাল বেলা হঠাৎ···

—আমাকে তখুনি ডাকলে না কেন?

—ও আপনিই সেরে যাবে।—ক'দিন ধ'রেই এ রকম টের পাচ্ছি মধ্যে মধ্যে,···তবে আজ বেদনাটা বেশী হয়েছে, তাই···

আস্তে আস্তে একটা বুক-কাঁপানো গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে রজনী চোখ বুজিয়ে নিলে।

বিশুর মাকে বুকে গরম জলের সেঁক দিতে ব'লে তখনি ডাক্তার ডেকে পাঠালুম। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন—এ বেদনা হার্টের জন্যেই। এর মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা হয়েছিল কি? উত্তেজনা এঁর পক্ষে ভারি অনিষ্টকর।

আমার বুকটা ধ্বক্ ক'রে উঠল, লিলির চিঠিখানা রজনী দৈবাৎ দেখে নি তো? কি ক'রে দেখবে? খাম বন্ধ ছিল, তার পর লাইব্রেরী ঘরে সে তো ক্বচিৎ কখনো যায়। যাই হোক্—

রজনীর ঔষধ-পথ্যের সুব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার বিদায় হ'লেন। লিলির কাছে যাওয়া ঘুরে গেল আমার, ও বেলা রজনী যদি ভাল থাকে, তবেই···

কি ভাগ্যি!—দুপুরের পর রজনী সাম্‌লে উঠল, তার পর যাব কি যাব না, করতে করতে পেছু না চেয়ে সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লুম।

* * * *

প্রথমেই দেখা হ'ল মিষ্টার ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে, তিনি তখন ড্রয়িং রুমে, হয়তো আজ সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোন নি, কিম্বা আমিই এসেছি তাড়াতাড়ি। যাই হোক্, আমাকে দেখেই তিনি ব্যগ্রতার সহিত বল্‌লেন—এই যে পবিত্র! এস, এস, আমি তোমারি অপেক্ষা করছিলুম, তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বল্‌বার আছে। বস না, দাঁড়িয়ে কেন?

আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে উঠল, কি কথা না জানি!

নমস্কার ক'রে পাশের চেয়ারে ব'সে আমি কুণ্ঠিতভাবে বললুম—কাল আসতে পারি নি, একটা কাজে আট্‌কা প'ড়ে—

—ও ! তাই বটে ?—লিলি অনেকক্ষণ তোমার জন্যে……হাঁ, দেখ বাবা, তোমাকে আমি পর ভাবি নে তো। তুমি আমার ছেলের মতো, আমি যা' বলব তোমাদের ভালর জন্যেই, সে জন্যে মনে রাগ-দুঃখ ক'রো না যেন—

এতটা ব'লে মিঃ ব্যানার্জ্জী পাইপ ধরাতে লাগলেন, ভূমিকা দেখেই প্রাণ চম্‌কে গেল। অসহিষ্ণু হ'য়ে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়েছিলুম তাঁর মুখের দিকে, তিনি পাইপ টানতে টানতে বারকয়েক কেসে বললেন—তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্যে কিছু সময় চাও, না ? বেশ ! সেটা কিন্তু এমন ক'রে হবে না। আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমাকে তা' হ'লে লিলির কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয় কিছুদিন, অন্ততঃ তিনটী মাস। কলকাতার বাইরে, যেখানে দু'জনে দেখা-সাক্ষাতের মোটেই সম্ভাবনা নেই—এমন জায়গায়।

—কোথায় যেতে বলেন ?

—সে যেখানে তোমার অভিরুচি, একলাই যে যেতে হবে, তার কোন মানে নেই, মোদ্দা, ঐ যে বললুম, লিলির সঙ্গে দেখার এতটুকু সুযোগ না থাকে, এমন কি, এর মধ্যে কেউ কাউকে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌তে পাবে না, বুঝ্‌লে কি না ?

প্রাণের ভিতর ভারি একটা যাতনা অনুভব ক'রে ত্রস্তে বললুম—এ যে আমার পক্ষে কত কষ্টকর……

—শুধু তোমারি নয় বাবা, লিলিরও। বাস্তবিক, ওকে নিয়ে আমি মহা ভাবনায় প'ড়ে গেছি, কাল তুমি আসতে পার নি, তাতেই যে রকম অস্থির হ'য়ে উঠেছিল! কিন্তু বল্‌ছি তো, তোমাদের দু'জনের মঙ্গলার্থেই আমি এ ব্যবস্থা করছি বাধ্য হ'য়ে। তোমরা ছেলেমানুষ, দিনকতক ছাড়াছাড়ি না হ'লে নিজেদের মন ভাল ক'রে বুঝতে পারবে না।

এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে মিঃ ব্যানার্জ্জী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—বেশী দিন নয় তিন মাস, এই তিন মাসের মধ্যে তোমাদের দু'জনার মনের গতিক কি রকম দাঁড়ায় দেখে তারপর আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করতে পারব। কি করি বল! মেয়ের বাপের দায়িত্ব যে বড় কঠিন বাবা! ওই মেয়েটীই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, ও যাতে যথার্থ সুখী হয়—আমাকে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করতে হবে যে! কি বল, এ প্রস্তাবে তুমি রাজি?

রাজি না হ'য়ে আর উপায়? আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম—বেশ, তাই হবে।

বল্‌লুম তো, কিন্তু মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল! তিন মাস দীর্ঘ কাল নয়, এ দেশ ও দেশ ক'রে দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কিন্তু এই ব্যবধানে যদি···যদিই লিলির মন বদলে যায়! মানুষের মন বলা তো যায় না, এই যে আমারি·········কি জানি নিয়তি আমার জীবনের ধারা এখন কোন্ দিকে নিয়ে যায়।

প্রাণে ভারি একটা ব্যথা ও অস্বস্তি নিয়ে গেলুম লিলির কাছে।

রাতের ফুল

লিলি তখন ভিতরের বারান্দায় ব'সে সঙ্গীত আলাপ করছিল— এস্রাজের মিঠে সুরে সুর মিলিয়ে। আহা! বসবার ভঙ্গিটুকুও কি সুন্দর, কি শোভন তার!

সুডোল মৃণাল বাহুর প্রতি সঞ্চালনে তার সূক্ষ্ম সবুজ শাড়ীর লুণ্ঠিত আঁচলখানি পিঠের উপর লুটিয়ে-পড়া, সবুজ ফিতার মাঝে গাঁথা দীর্ঘ বেণীটী, কানের পান্নার দুল দু'টী তালে তালে দুলে উঠছে কি মধুর ভাবে! সমস্তই সবুজ, গলার পান্নার কণ্ঠী পর্য্যন্ত—এ যেন সবুজের সমারোহ! চমৎকার! এর কাছে রজনী!—প্রস্ফুট গোলাপের কাছে রজনীগন্ধা!

আমার চলৎশক্তি, বাক্‌শক্তি—সমস্তই যেন লোপ পেয়ে গেল, মন্ত্র-মুগ্ধের মত স্তব্ধ হ'য়ে নির্ণিমেষে চেয়ে রইলুম সেই অনুপমা তরুণীর পানে। লিলি তার মধুর কণ্ঠে সুধা বর্ষণ ক'রে গাইছে—

"তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!"

গানের ভাষা প্রাণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে গায়িকার ভাবাবেশময় আয়ত আঁখি দু'টীতে, সে আঁখি যেন মৌন বেদনায়, নিবিড় ব্যাকুলতায় ঢল ঢল, ছল ছল হ'য়ে বল্‌ছিল—

"তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!"

সব ভুলে গেলুম। আমার সব চিন্তা, সব ব্যথা ডুবে গেল সেই গানের সুধা-সাগরে। মনে হ'ল যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি। ঐ যে রূপময়ী স্বপন-রাণী — ও শুধু আমারই — একান্ত আমারই আপন, জগতের কোন শক্তিই ওকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

"আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!"

শেষের এই লাইনটীতে উচ্ছল হিয়ার সমস্তখানি আবেগ চেপে একবার, দু'বার, তিনবার ব'লে লিলি নীরব হ'য়ে গেল। আমার মুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—বাঃ! সুন্দর! অতি সুন্দর!

লিলির নিটোল গাল দু'টীতে যেন রাঙা গোলাপ ফুটে উঠল। চকিত নয়নে আমার পানে চেয়ে, মধুর সলাজ হাসি হেসে সে বল্‌লে—বা রে! আপনি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে······কখন এলেন?

—বল্‌তে পারি নে, হয়তো তুমি যখন গান আরম্ভ করেছ, তখন থেকেই। লুকিয়ে শোনা যে অন্যায় তা' মনেও পড়ে নি এতক্ষণ, তোমার গানের এমনই মোহিনী শক্তি লিলি!

—ইঃ! ভারি তো গান! সময় কাটছিল না—তাই······

লিলি এস্রাজ নামিয়ে রেখে সেই বেঞ্চেই জায়গা ক'রে দিয়ে বল্‌লে—বসুন, কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তো ভাবলুম আজও এলেন না বুঝি!

—তা' কি হয়? কাল নিতান্তই সময় পাই নি ব'লেই······

—জানি, কাল থিয়েটারে গেছলেন, না? কিন্তু তার আগে,

সন্ধ্যে বেলা তো একবারটী আসতে পারতেন—আধ ঘণ্টার জন্যেও, তাতে থিয়েটার ফুরিয়ে যেত না তো?

লিলি আমার মুখপানে চেয়ে রইল। তার কথার সুরে, চোখের চাহনীতে শুধু অভিমান নয়, আরো একটা কিসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, যার মর্ম্ম বুঝে আমার বিকশিত চিত্ত সঙ্কোচে এতটুকু হ'য়ে গেল। অধোবদনে বল্লুম—আমাকে ক্ষমা করো লিলি, আমি তোমার কাছে অপরাধী!

—ও কি? রাগ হ'য়ে গেল আপনার? আচ্ছা, আমি এমন কি বলেছি যা'তে……

—না লিলি, রাগ করব কেন? আমি যে বাস্তবিক অপ-রাধী, এ অপরাধ আমার অজ্ঞানকৃত নয়, জ্ঞান কৃত, এর প্রায়শ্চিত্ত এবার করতে হবে শীগ্‌গিরিই, মিঃ ব্যানার্জ্জী আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন শুনেছ তো?

লিলির মুখখানি নিমেষে ম্লান হ'য়ে গেল, সে মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বল্লে—শুনেছি, কিন্তু কোন দরকার ছিল না এ ব্যবস্থার। আমার বিশ্বাস বাবা ভুল করছেন, সত্যকে পরখ করতে কোথাও যেতে হয় না, ও যে নিজের মন দিয়েই বোঝবার……

—ঠিক্ বলেছ লিলি, সত্য মিথ্যা নিজের মন দিয়েই বোঝা যায়, আমিও বুঝেছি। শুধু একটু সংশয়, সেটা দুর্ব্বলতাও হ'তে পারে—তারই জন্যে এ নির্ব্বাসন দণ্ড। যাই হোক্ তোমার বাবার এ ব্যবস্থা আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে, শত কষ্ট হ'লেও।

—কি জানি, বাবা বলেন—সোনা আগুনে না পুড়লে খাঁটি হয় না।.........

—বেশ, তাই হোক্, কিন্তু লিলি, এ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ফিরে আসা পর্য্যন্ত তুমি আমার অপেক্ষা করবে তো?

—বিশ্বাস হয় না?—কি ক'রেই বা হবে, যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না.........

অতি মিষ্ট অভিমানের সুরে কথাটা ব'লে লিলি আমার মুখ-পানে তাকালে, সেই সন্ধ্যারতির দীপের মতো পবিত্রোজ্জ্বল, দর্পণের মতো স্বচ্ছ চোখ দু'টীতে তার মনের দৃষ্টি সুস্পষ্ট! দেখে আমার মনের আঁধার কেটে গেল নিঃশেষে। পুলকিত হ'য়ে বল্লুম—তুমি আমাকে বাঁচালে লিলি! এই চিন্তাই আমাকে সব চেয়ে বেশী ব্যথা দিচ্ছিল। এখন আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারব নির্ব্বাসনে—

—একলাই যাবেন?—না—কি...

লিলি মুখ ফুটে যা' বল্‌তে পারলে না, তা' বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। মর্ম্মে আহত হ'য়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, গাঢ় স্বরে বল্লুম—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর লিলি, তোমাকে আমি পাই বা না পাই, সারা জীবনটাই যদি দুর্ব্বহ, দুঃখের বোঝা হ'য়ে যায় আমার, তবু তোমার সঙ্গে প্রতারণা আমি করব না কোনো দিন।

—তা' আমি জানি, জানি ব'লেই সব শুনেও এখনো......

লিলি আমার কাছে স'রে এসে বল্‌লে — কোথায় যাবেন? এই মধুপুর-টুর কাছাকাছি কোথাও—

—না, আমি দূরে, অনেক দূরে যাব লিলি! কাছে থাকলে

হয়তো কথা রাখতে পারব না, হয়তো……আঃ! দিনগুলো যে কি ক'রে কাটবে! তিন মাস — তিন যুগের মতো দীর্ঘ।

—তার চেয়েও বেশী! কিন্তু এ কষ্ট তো তুমি ইচ্ছে ক'রেই…

লিলির মুখের এই 'তুমি' সম্বোধনে যুগপৎ আমার বুকের শোণিত উদ্বেল, আতপ্ত হ'য়ে উঠল। ইচ্ছে ক'রে? হ্যাঁ, তাই তো, লোকে বিবাহিতা স্ত্রীকেও ত্যাগ করছে বিনাপরাধে, সেই রকম আমিও যদি রজনীকে……

আঃ রজনী! রজনী! আমার আনন্দোজ্জ্বল সুখের জীবনে সে যেন অভিশাপ হ'য়ে এসেছে। যেখানেই যাই—এ অভিশাপ ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে?—না, আর নয়, এবার আমি মুক্ত হব, শক্ত হব।

আমি নিজে যদি অটল থাকি, তা' হ'লে আমাকে ঠেকিয়ে রাখে কে?

হর্ষ-বিষাদের বিপুল উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম, তখনো আমার সারা অন্তরখানি আচ্ছন্ন হ'য়েছিল লিলির সেই গানে—

"আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!"
—তাই হবে, তাই হবে, ওগো আমার প্রিয়তমা!

* * * *

রজনী ঘুমিয়ে পড়েছে—সে ভালই আছে তা' হ'লে। যাক্ বাঁচা গেল।

রজনীর কথা

মানুষের মন অন্তর্য্যামী বুঝি!

আমার মনটা এত অস্থির হয়েছিল এই রকম ঘটবে ব'লেই···

হুঁ, জমীদারীর কাজ!—ছাই!

আমি কি বুঝি নি? বুঝেছিলুম সব, শুধু এতটুকু সন্দেহ ছিল, এতটুকু আশা,······মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটী নক্ষত্রের মতো, তা'ও ডুবে গেছে। এখন অন্ধকার! বুকচাপা জমাট অন্ধকার! উঃ! এত অন্ধকার নিয়ে আমি বাঁচব কেমন ক'রে?

বাঁচতে তো চাই নে, দিন-রাত মৃত্যুকামনা করছি—একবার নয়, সহস্রবার।

ডাক্তার ব'লে যান—কোন ভয় নেই, আপনি সেরে যাবেন, মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখুন।

উনিও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। মনে মনে হাসি। ওষুধ?—বিশুর মা ঢেলে দিয়ে যায়, ওই পর্য্যন্ত! ও সব না ক'রে একটুখানি শান্তিতে মরতে দিলেই তো হয়! মিথ্যাকে, ছলনাকে সত্য মনে ক'রে এতদিন যে ভাবে কেটেছে—শেষের ক'টা দিনও যদি তেমনি কেটে যেত!

ও দিকে জ্বর্ সইছে না যে! ধৈর্য্য যে থাকে না!

কি করি বল? প্রাণ তো জোর ক'রে গলা টিপে বা'র করবার নয়! কত লোক হার্টফেল ক'রে মরছে, তাই হোক্ না, মেয়ে-মানুষের হার্ট বুঝি পাথরের তৈরী?

রাতের ফুল

আজ ধোপাকে কাপড় দেবার সময় বেয়ারা বল্‌লে—এবার কাপড় খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে, বুঝলে? বাবু আজকালের মধ্যে বাইরে যাবেন।

কথাটা শুনতে পেলুম। কোথায় যাবেন? জমীদারীর কাজে না কি? এখানে আর স্থবিধে হ'চ্ছে না?—কেন গো? আমি তো বাধা দিচ্ছি নে, দিতেও চাই নে। জানি—রজনীগন্ধা লিলি হ'তে পারে না!

মনে করেছিলুম—ও কথা আর তুলব না, চুপ ক'রে শুধু দেখেই যাব, কতদূর হয়, কিন্তু পারলুম না থাকতে।

ওঁকে জিজ্ঞাসা করতেই প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন।

—না তো, কে বল্‌লে?

তারপর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লেন—ডাক্তার সে দিন বল্‌ছিলেন কি না......এই উত্তেজনাটা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ, তাই ভাবছি—দিনকতক তফাতে থাকতে পারলে......

আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। ওঃ!—আবার! আবার ছলনা!

আমাকে আগাগোড়াই তো ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, আমি পাগল, তাই বুঝেও বুঝি নি। কিন্তু এবার যে একেবারে চূড়ান্ত! আমাকে এই অবস্থায় একা ফেলে......

মাগো! তুমি আজ কোথায়? তোমার রজনীর জীবনে এ কি নির্ম্মম অভিশাপ দিয়ে গেলে মা! এর চেয়ে জন্মমাত্রই তা'কে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে যদি......

বুকের ভিতর ধড়্‌ফড়্‌ করতে লাগল। সেই বেদনাটা আবার

বুঝি······উঃ!—ভীষণ যন্ত্রণা! দু'চোখে অন্ধকার দেখে প'ড়ে যাচ্ছিলুম, উনি ধ'রে ফেল্‌লেন।

সারাটা রাত ছট্‌ফট্‌ করেছি — একবারও চোখের পাতা এক হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে উনিও জেগে রইলেন, এত বারণ করি, তবু··· সে কি ব্যাকুলতা!

—একটু কম পড়ল ব্যথাটা? — বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি? — বুকে হাত বুলিয়ে দেব?—ডাক্তারকে আর একবার ডেকে পাঠাই?—

এমনি ধারা অধীর প্রশ্ন—পাঁচ মিনিট অন্তর। ওঁর সে কাতরতা দেখে অত কষ্টের মধ্যেও আরাম পাচ্ছিলুম যেন।

এ তো ছলনা নয়, কপট আদরের মিছে অভিনয় নয়, আন্তরিক দরদ—প্রাণের টান! সে দিন বাঁচতে সাধ হয়েছিল আবার, কিন্তু এখন মনে হয়—সেই রাত্রিই যদি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হ'ত!

ভোরের দিকে আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, অনেক বেলায় ঘুম ভেঙ্গে দেখি—উনি তখনও আমার পাশে ব'সে! ওঃ! এত আদর!—তবে কেন······

আমার চোখে জল এসে পড়ল, ইচ্ছা হ'ল ওঁর বুকে মাথা রেখে একবার মুখ ফুটে বলি, মরণাহত লতায় এ স্নিগ্ধ বারি-সিঞ্চন কেন গো!

আমাকে চোখ চাইতে দেখেই উনি আমার মাথায় হাত রেখে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে বল্‌লেন — কেমন আছ রোজি? ব্যথাটা একটু কমেছে না?

রুদ্ধ আবেগে ওঁর হাতখানা কপালে চেপে বল্‌লুম — সেরে গেছে ব্যথা।

—সারবেই তো……সারাটা রাত—কম কষ্ট পেয়েছ? উঃ!

আমার কপালে-এসে-পড়া এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে উনি আদরমাখা মিষ্টিস্বরে বল্‌লেন—আমি কি ভাবছি জান রোজি? তোমাকে এখান থেকে দিনকতকের জন্যে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ওষুধের চেয়ে তোমার 'চেঞ্জে' বেশী উপকার হবে মনে হয়।

কথাটা সহসা বিশ্বাস হ'ল না। মানে—এ 'চেঞ্জে' যাওয়ার অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই তো? যদি শুধু নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই……

না, না, ছিঃ! এ আমি কি ভাবছি?—সেই মতলবই থাকবে যদি, তা' হ'লে আমার জন্যে এত যত্ন, এত ব্যাকুলতা কেন?

ঐ যে ওঁর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে, মমতা ঝ'রে পড়ছে, ও কি ছলনা হ'তে পারে? কখনো না, এ মিছে সন্দেহ, শুধু আমার অবিশ্বাসী মনের দোষ।

আমাকে নীরব দেখে উনি আমার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আমার শুষ্ক তৃষিত অধরে অধর স্পর্শ ক'রে বল্‌লেন—কি ভাবছ বল তো? যেতে পারবে না?

আমার অন্তরের সকল দৈন্য, সকল গ্লানি মুছে গেল সেই আদরটুকুতে, পাশ ফিরে ওঁর কোলের উপর হাতখানা রেখে বল্‌লুম—পারব, তুমি সঙ্গে ক'রে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাব, কিন্তু……কাশীতে নয়।

—পাগল! কাশীতে কি করতে যাব? এ তো আর তীর্থ-যাত্রা নয়? রোগ সারাতে যাওয়া। পশ্চিমের কোন দূর স্বাস্থ্যকর স্থানে, পাহাড়ে যেতে পারলেই ভাল হয়, ঠাণ্ডায় শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

—বেশ তো, তাই চল।

বড় আশ্চর্য্য মনে হ'চ্ছিল। ওঁর মতিগতি হঠাৎ ফিরে গেল যে! হয়তো আমার অবস্থায় দয়া ক'রে—কিম্বা ও দিক্ থেকে কোন রকম·········যাই হোক্ — এ পরিবর্ত্তন আমার পক্ষে শুধু অপ্রত্যাশিত নয়—আশাতীত।

*　　*　　*　　*

বাঁধা-ছাঁদার ধূম প'ড়ে গেছে।

সুদূর প্রবাস-যাত্রা, ফিরতে কতদিন লাগে, তার কিছু স্থিরতা নেই, কাজেই—

আমার অবসাদগ্রস্ত ক্লান্ত দেহ-মনে যেন নূতন শক্তি অনুভব করছি, শুধু দেশ-ভ্রমণের আনন্দে নয়, একটা অনিবার্য্য, আসন্ন বিপদ-মুক্তির আশু সম্ভাবনায়।

প্রথমটা ওঁরও খুব উৎসাহ দেখেছিলুম—নিজের হাতে বই-টই সব গোছানো, সে উৎসাহ শেষ পর্য্যন্ত রইল না।

যাবার সময় উনি এমন ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়লেন যে, দেখে আমার কষ্ট বোধ হ'ল। বল্লুম — তোমার যদি ইচ্ছে না হয় যেতে, তবে থাক্ না, পরে গেলেই হবে।

উনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বল্লেন—পরে গেলে চলবে না তো! — আমাকে যেতেই হবে।

রাতের ফুল

এ যে কিসের জোর তাগিদ—ভগবান্ জানেন!

*　　　　*　　　　*　　　　*

আমরা দেরাদুনে এসেছি কাল।

এখানে দিনকতক থেকে মুসৌরী যাওয়া হবে।

পাহাড়ের তলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সহরটী, যেন ছবির মতো দেখতে।

'ন্যাশভিল্ রোডে' একখানা বাংলো ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সহর থেকে তফাতে, বাংলোর মস্ত বড় কম্পাউণ্ড, তার মধ্যেই বাগান, হরেক রকম ফল-ফুলের গাছ-পালা, লতা-গুল্ম, তাতে রং-বেরংয়ের কত রকম পাখী আসে—যা' কখন দেখি নি। বেশ নিরিবিলি জায়গাটী—ভারি সুন্দর লাগছিল।

কোন রকম ঝঞ্ঝাট নেই, গোলমাল নেই, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি যেন! বাস্তবিক, মনে হ'চ্ছিল আমার নূতন জীবন লাভ হয়েছে।

এখানে এসে ওঁর মনটাও ভাল আছে বোধ হয়। সকাল-বিকেল আমাকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যান। কখন কাছাকাছি পায়ে হেঁটে, কখন ট্যাক্সি ক'রে দূরে, লোকালয়ের বাইরে, প্রকৃতি-রাণী যেখানে নিরালায় নিজের হাতে আনন্দ-বাসর সাজিয়ে রেখেছেন।

দুপুরে নির্জ্জন ঘরটীতে আমরা দু'জনে—উনি গল্প করেন, বই প'ড়ে শোনান, ঘরের বাইরে বড় আমগাছটার ঘন পল্লবিত মুকুলিত শাখায় 'বউ কথা কও' পাখী তার মানিনী বধূর মধুর মান-ভঞ্জন গীতি অবিরাম গেয়ে যায়, আমি চুপ ক'রে শুনি—শুধু শুনি। মুখের ভাষা মৌন নীরব হ'য়ে যায়, বুকভরা ভাবের উচ্ছ্বাসে!

রাতের ফুল

সন্ধ্যাবেলা আঙুরের জাফ্‌রীর কাছে চামেলীর ঝোপের-ধারে-পাতা বেঞ্চির উপর ব'সে আমি এস্রাজ বাজানো অভ্যাস করি, উনি গান করেন। কখন ওঁর কাঁধে মাথা রেখে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকি, দূরে ঝাপ্‌সা-হ'য়ে-আসা পাহাড়ের ফাঁক থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে সন্ধ্যার তরুণ চাঁদখানি সামনের হেলে-পড়া বাঁশ-ঝাড়টার মাথায় এসে পড়ে, ওঁর মুখের 'পরে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেয়, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মনে প'ড়ে যায় সেই গানটা—

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল—"

সমাজের ভ্রূকুটি নেই, লোক-লজ্জার আতঙ্ক নেই, অবাধ মিলনের বিপুল পুলকে দিন-রাত্রিগুলো মধুর—মধুরতর হ'য়ে অবিচ্ছিন্ন সুখ-স্বপ্নের মতো কোথা দিয়ে যে চ'লে যায়, টের পাই নে।

হায়! আমার অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবনে ক্ষণিকের পাওয়া সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি যদি কোন দয়াল দেবতার বরে অফুরন্ত ক'রে রাখতে পারতুম!

তা' কি আর হয়?

সে সুখের দিন ফুরিয়ে এল দেখতে দেখতে।

দিন পনের না যেতেই লক্ষ্য করলুম উনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন। বড্ড বেশী উত্তেজনার পর যেমন অবসাদ আপনি এসে পড়ে, এ যেন সেই রকম।

কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই আর। বেড়াতে কোনদিন যান, কোনদিন যান না, কখন 'যেতে ইচ্ছে করছে না' ব'লে কোন্ ফাঁকে একলাই বেরিয়ে পড়েন।

সর্ব্বদাই কেমন উন্মনা ভাব, একটুতেই বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন। এ রকম স্বভাব তো ওঁর ছিল না!

সে দিন কোথা হ'তে কি জানি ঘুরে এসে ধুপ্ ক'রে শুয়ে পড়লেন শ্রান্তভাবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই বল্লেন — নাঃ! আর তো পারা যায় না।

—কি পারা যায় না?—জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন—আর ভাল লাগছে না এখানে থাকতে। এবার তল্পী-তল্পা বেঁধে ফেলা যাক্।

আমার বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল—এখনই? এরই মধ্যে?

ওঁকে বল্লুম—কোথায় যাবে? কল্‌কাতায়?

উনি একটু চম্‌কে গিয়ে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে তিক্ত স্বরে ব'লে উঠলেন — কল্‌কাতায় এরই মধ্যে কি ক'রে যাই? যাবার জো আছে কি? আমি মুসৌরী যাবার কথা বল্‌ছিলুম।

তবু ভাল! কিন্তু কোনখানেই নড়তে ইচ্ছে করে না আর, ভয় হয় ঠাঁই নাড়া হ'লে এ নিভৃত শান্তির নীড় আমার ভেঙ্গে যায় যদি!

মনে সাহস এনে বল্লুম—তাড়াতাড়ি কি?—আমার তো এখানে বেশ লাগছে।

—তা' লাগতে পারে, কিন্তু তোমার বেশ লাগলেই যে আমার লাগতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই!

স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম। এ বিরাগ, বিরক্তি কা'র উপর, আমারই উপর তো? কিন্তু আমার অপরাধ? নিজেই তো সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন—আমি কি পায়ে ধ'রে সেধেছিলুম না কি?

রাতের ফুল

আবার ঘণ্টা খানেক বাদেই উনি আমার কাছে এসে যখন কোমল ভাবে বল্‌লেন—তুমি ঠিক বলেছ রোজি, মুসৌরী যাবার এখন তাড়া কি? এ মাসটা এখানে কাটিয়ে গেলেই হবে। তোমার যখন এত ভাল লেগেছে…

তখন মনের রুদ্ধ অভিমানের বেগ আর চাপতে না পেরে চট করে ব'লে ফেললুম—আমার ভাল-মন্দে কি এসে যায়, তোমার যেখানে খুশী সেখানেই চল না!

—রাগ ক'রো না রোজি, তোমার ভালর জন্যেই আমি……… মুসৌরী এখান থেকে তিন-চার হাজার ফিট্ উঁচু, আর 'হেল্‌দি প্লেস্', তাই বল্‌ছিলুম। নইলে আমার কি? আমার পক্ষে দেরাদুন, মুসৌরী, কাশ্মীর—সব সমান!

ওঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটু করুণ বেদনার আভাস ছিল যে, কথাগুলি আমার মর্ম্ম স্পর্শ করলে। মনে করলুম, বলি — তবে কল্‌কাতাতেই ফিরে চল না……

কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না।

ওঁকে ব্যথা দিলে সে ব্যথা যে নিজের বুকেই এসে লাগে!

দেরাদুনেই থাকা হ'ল আপাততঃ।

এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি সত্যিই ভাল ছিলুম, শুধু মানসিক নয় শারীরিকও। কিন্তু ক'দিন ধ'রে সেই বেদনাটা মধ্যে মধ্যে, টের পাচ্ছি, তবে তেমন বাড়াবাড়ি আর হয় নি। ওঁকেও বলি নি,

বললেই তো আবার সেই ডাক্তার আর ছাই-ভস্ম ওষুধের ধুম প'ড়ে যাবে, দরকার কি?

অনাবশ্যক—অনাবশ্যক এ জীবন।

এ দিকে মনোযোগ দেবার অবস্থাও ওঁর নয় এখন। সর্ব্বক্ষণ নিজের ভাবেই বিভোর! সময় সময় এত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন যে, সহজে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

আমার সঙ্গ তাঁকে আনন্দ দেয় না, তাই পাশ কাটিয়ে থাকতে চান। বুঝতে পারি সবই, কিন্তু কি করি? নিরুপায়! এক এক সময় ভাবি—দূর হোক্ ছাই…ওঁর সুখের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে কোন খানে চ'লে যাই—যে দিকে দু' চোখ যায়, আবার একবারটী 'রোজি' ব'লে আদর ক'রে ডাকলেই সব ভুলে যাই! পোড়া প্রাণ বেরিয়েও বেরোয় না ঐ জন্যেই বুঝি?

দিনগুলো আবার দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছে, সময় যেন ফুরোয় না।

'বউ কথা কও' পাখী ডেকে ডেকে, সেধে সেধে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, চামেলীর ঝোপে চামেলীগুলো ফুটে নীরবে ঝ'রে যায় ব্যর্থতার অভিমানে, সন্ধ্যার উতলা বাতাসে দ্রাক্ষা-কুঞ্জ শিউরে ওঠে, চাঁদ সেই বাঁশ-ঝাড়টার পাশে এসে থম্‌কে চেয়ে থাকে অবাক্ হ'য়ে — সবই তেমনি কিন্তু নিষ্ফল, ব্যর্থ!

কত সাধের প্রতীক্ষিত মুহূর্ত্তগুলি চ'লে যায়—শুধু উপেক্ষার ব্যথা নিয়ে, দিন আর কাটে না!

রাতের ফুল

হাতে কোন কাজ নেই, একটা কথা বল্‌বার লোক নেই, গান-বাজনায় রুচি নেই, বই প'ড়ে আর কতক্ষণ কাটানো যায়?

উনি বেলা থাকতেই বেরিয়ে গেছেন রাজপুরের দিকে। আমাকেও একবার বলেছিলেন মন-রাখা-গোছ, আমি যাই নি।

কাজ কি? আমার সঙ্গ যদি ওঁর ভালই না লাগে......

একলাটী বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। খানিক আগে এক পসলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে।

গাছপালাগুলো সব ধুয়ে গিয়ে উজ্জ্বল শ্যামল শোভায় ঝল্‌মল্‌ করছে।

বন-গোলাপ-লতার থোকা-থোকা গোলাপগুচ্ছগুলি তখনও টস্‌-টস্‌ ক'রে চোখের জল ফেল্‌ছিল।

অন্য মনে এ দিক্‌ সে দিক্‌ ঘুরতে ঘুরতে আমি বাগানের শেষ-প্রান্তে এসে পড়লুম, এ দিক্‌টায় এ পর্য্যন্ত আসি নি কখনো। ঘন সবুজ আইভি-লতায় ছাওয়া অনুচ্চ পাঁচিলের ওধারেই আর একখানা নীল রংয়ের ছোট বাংলো দেখা যায়, তার সামনের কম্পাউণ্ড সবুজ ঘাসে ঢাকা, কয়েকটা ফল ও ফুলের গাছও আছে।

ওখানে কে থাকে?

কাছে আসতেই আমার কানে গেল শিশুকণ্ঠের অস্ফুট মধুর কলধ্বনি।

পাঁচিলের উপর থেকে উঁকি মেরে দেখলুম—একটী ছোট্ট ছেলে, বছরখানেকের হবে হয়তো। সামনের ফুলের কেয়ারির উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে দু'হাতে ফুল ছিঁড়ছে। লাল, নীল, গোলাপী — নানান

রংয়ের ফুল মুঠো ভ'রে ভ'রে ছেঁড়ে, আর পেছু পানে চায়—সে যে কি আনন্দ—কি স্ফূর্ত্তি!

কিন্তু সে স্ফূর্ত্তিতে বাধা প'ড়ে গেল তার অচিরে।

—ও-মা! মা, মা! কি দস্যি ছেলে গো!—ফুলগুলো সব ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলে একেবারে তচ্‌নচ্‌ ক'রে!—

বলতে বলতে সেখানে ছুটে এলো একটী তরুণী, তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটী খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল—মুক্তোর মত সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত ক'টী বার ক'রে, ভারি যেন একটা মজা হয়েছে!

—তবে রে দুষ্টু!—দোষ ক'রে আবার হাসি!—লজ্জা নেই তোমার? দাদু দেখলে যে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে?

তরুণী শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তার ফুলো ফুলো নরম গাল দু'টী আদর ক'রে টিপে দিলে। শিশুর হাসি থেমে গেল, মুঠোয়-ভরা ফুলগুলো সব তরুণীর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে চুলের গোছা ধ'রে টানতে লাগল 'যাঃ, যাঃ!' ক'রে।

—উঃ! লাগে যে! ছাড়্‌, ছেড়ে দে দস্যি!

শিশুর ক্ষুদ্র মুষ্টিবদ্ধ কেশগুচ্ছ মুক্ত করতে করতে তরুণী সহসা আমার দিকে তাকাতেই আমি হেসে ফেললুম। সে-ও হাসতে হাসতে বল্‌লে—এক কোঁটা তো ছেলে, তার বিক্রম দেখ না—

ব'লে আমার দিকে এগিয়ে এল। তরুণী আমার সমবয়সীই হবে। বেশ গোলগাল দোহারা গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, হাসি-হাসি ঢলঢলে মুখখানি, একরাশ কালো চুল পিঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাতে চিরুণী গোঁজা, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে উঠে এসেছে বুঝি!

রাতের ফুল

আর শিশুটী ভারি সুন্দর দেখতে, যেন আধ-ফোটা একটী বাসন্তী গোলাপ!

পাঁচিলের ও ধারে দাঁড়িয়ে তরুণী আমার মুখপানে চেয়ে হাসিমুখে বল্‌লে—আজ যে বড় এ ধারে এলে ভাই? কখনো তো আস না।

—এমনি ঘুরতে ঘুরতে, তোমরা ঐ বাংলোটায় থাকো বুঝি? ক'দ্দিন হ'ল?

—অনেক দিন, বাবা এখানে আছেন চার-পাঁচ বছর—কি তার বেশী, আমি অবিশ্যি মাসখানেক হ'ল এসেছি।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখি নি এ'দ্দিন!

—কি ক'রে দেখবে বল? অনবরত দু'টীতে মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে থাকবে চকা-চকীর মতো, তা' পাড়া-পড়সীর খবর রাখে কে?

মেয়েটী বক্রদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্‌লে, বল্‌লে—রাগ ক'রো না ভাই! তুমি আমার সমবয়সী, তাই··· ক'দিন ধ'রেই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ছোঁক্ ছোঁক্ করছি, কিছুতেই জো পাই নি—আজ যে বড় কর্ত্তাটী তোমায় ছেড়ে দিলেন?

মেয়েটীর সরলভাবে-বলা সেই কথাগুলি শ্রুতিমধুর হ'লেও আমার মরমের ঠিক ব্যথার জায়গাতে আঘাত করলে। জোর ক'রে একটু হাসি এনে বল্‌লুম—ছোঁক্ ছোঁক্ করবার দরকার কি ছিল! এক-দিন চ'লে এলেই তো হ'ত! এ খোকা বুঝি তোমার?

—হ্যাঁ, ইনি আমার পুত্ররত্ন! তোমায় দেখে কেমন চুপটী ক'রে আছে দেখ! যেন কিচ্ছু জানে না! দুষ্টু কোথাকার!

রাতের ফুল

খোকা তখন দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে, মুখে একটী আঙ্গুল দিয়ে, আমার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়েছিল জলজ্বলে চোখ দু'টী তার মেলে। বাঃ, ভারি সুন্দর তো!...কি মিষ্টি মুখখানি! খোকা, আসবে আমার কোলে?—এসো, এসো, লক্ষ্মী ছেলে!

আমি হাত দু'খানি বাড়াতেই খোকা আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কতদিনের চেনা যেন! খোকার মা সকৌতুকে বল্লে—এ কে রে—খোকন? বল্ দেখি এ কে?

খোকন আমার মুখ পানে খানিক চেয়ে থেকে আমার গালে ছোট্ট কচি হাতখানি রেখে আধ-আধ মিষ্টস্বরে বল্লে—ইঃ!—মা!

শিশুকণ্ঠের সেই ক্ষুদ্র 'মা' শব্দে কি মোহ ছিল জানি নে, এক অনাস্বাদিত পুলক-রসে আপ্লুত হ'য়ে আমার সমস্ত অন্তর যেন সাড়া দিয়ে উঠল, সেই প্রাণ-গলানো মধুর ডাকে।

—কে রে সোনা! কে রে মাণিক আমার!

উদ্বেলিত মমতায়, গভীর আবেগে তার কচি মুখে চুমো খেয়ে দু'হাতে তাকে বুকে চেপে ধরলুম—আঃ! কি মধুর স্নিগ্ধ স্পর্শ তার! বুক যেন জুড়িয়ে গেল।

তরুণী বিস্মিত পুলকিত হ'য়ে হাসতে হাসতে ব'লে উঠল—কি ছেলে বাবা! কোলে যেতে না যেতেই মা পাতিয়ে ব'সে আছে! কিন্তু তোমার কোলেই ওকে মানিয়েছে, সত্যি তুমি যেমন সুন্দর—তেমনি ও—

—আর তুমি? তুমি বুঝি কুৎসিৎ?

—কুৎসিৎ না হ'লেও সুন্দর তো নই? আমার শ্বশুর বাড়ীর

সকলেই খুব সুন্দর, ননদেরা যেন মেমের মতো ফুট্‌ফুটে। তাদের সামনে আমার এমন লজ্জা ক'রে ভাই!……ও-মা! ও কি?—খোকন তোমায় কি রকম চেপটে আছে দেখ, যেন কতকালের চেনা! হ্যাঁ ভাই, তোমার কি ছেলেপুলে হয় নি? তা' তাড়াতাড়ি কি?—হ'লেই তো নানান ঝঞ্ঝাট। আমার শাশুড়ী বলেন…তোমার শাশুড়ী-ননদ কেউ নেই, না? শুধু কর্ত্তা আর গিন্নি?—বাঃ, বেশ আছ ভাই দু'টীতে, কপোত-কপোতী সম………

—রমা! কোথায় গেলি রে—চুলটুল আজ বাঁধবি নে না কি?

মায়ের আহ্বানে রমার অনর্গল বাক্যস্রোতে, হাসির উচ্ছ্বাসে বাধা প'ড়ে গেল, সে—এই যে যাই মা!—ব'লে খোকনের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—আয় রে খোকন! দিদা ডাকছে। তা' হ'লে চল্‌লুম—হ্যাঁ ভাই, তোমার নাম তো জিজ্ঞেস করলুম না!

—আমার নাম রজনী।

খোকন আমাকে ছাড়তেই চায় না, আশ্চর্য্য!—তাকে জোর ক'রে রমার কোলে দিয়ে বল্‌লুম—কাল আবার দেখা হবে তো?

—ও! তা' আর বল্‌তে? কাঙাল শাকের ক্ষেত দেখেছে যখন—আচ্ছা, কাল তুমি আমাদের বাড়ী একবার এসো না ভাই! মা কত খুশী হবেন, এ ধারে বাঙ্গালীর বাস তো বড় একটা নেই! আসবে তো? কখন সময় হবে বল — আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

—তোমাকে আসতে হবে না ভাই, আমি নিজেই যাব বিশুর মাকে সঙ্গে ক'রে, তোমার কখন সময় থাকে……

—আমার সময় সর্ব্বক্ষণই! কি আর কাজ? এই খোকনবাবুর খবরদারী শুধু। আচ্ছা, তা' হ'লে চলি এবার। তুমি এসো কিন্তু, ভুলো না ভাই!—কর্ত্তা ছেড়ে দেবেন তো?

মুচকি হেসে চোখের একটা ইসারা ক'রে রমা ছেলেকে নিয়ে চ'লে গেল। দিব্যি মেয়েটী, আনন্দের ঝরণা যেন! আর খোকন··· ক্ষুদে যাদুকর একটী! ক্ষণিকের আদর-স্পর্শ দিয়ে আমার অতৃপ্ত বুকে কি আকুল তৃষ্ণাই জাগিয়ে গেল সে!

আমি এতদিন কল্‌কাতায় আসা পর্য্যন্ত ঘরের কোণ আঁকড়েই পড়েছিলুম সোনার খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মতো, যদিও এ বন্দীত্ব আমার ইচ্ছাকৃত। উনি কত বল্‌তেন, সময় সময় রাগও করতেন, কিন্তু আমার সাহস হয় না বাইরের কারও সঙ্গে মেলা-মেশা করতে, কারণ আমি তো জানি—আমি কি······

তবে এই দূর প্রবাসে অচেনা লোকের মধ্যে নিজেকে গোপন রাখবার কোন হেতু দেখি নে, সুতরাং রমার সঙ্গে আলাপ করতে ক্ষতি কি? তাতে বরং নিঃসঙ্গতার কষ্ট অনেকটা লাঘব হ'তে পারে, আর···আর সেই ননীর পুতুল খোকনকে কোলে করতে পাই।

শেষের আকর্ষণটাই যেন প্রবল হ'য়ে টানছিল আমাকে। ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে পরদিন বৈকালের আগেই রমাদের বাড়ী গেলুম।

আমাকে দূরে থেকে দেখতে পেয়েই রমা ছুটে এল, আমার হাত ধ'রে সহাস্যে সে বল্‌লে—কি ভাগ্যি! আমি মনে করেছিলুম গরীবের ঘরে তুমি আসবে না ভাই!

তুমি যদি গরীব, তবে ধনী আর কে

রাতের ফুল

রমার বিনয় বচনের উত্তরে কথাটা মনে এলেও মুখ ফুটে বল্‌তে পারলুম না। এই জম্‌কাল হীরে-মোতির আড়ম্বরের আড়ালে আমার দৈন্য যে কোথায় লুকিয়ে আছে, বেচারা তা' জানে না তো! জানলে কি আমার সঙ্গে আজ এমন ক'রে……

আমার মৌন ভাবে রমা অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌লে—কি হ'ল ভাই? মুখখানা অমন ভার কেন? কর্ত্তা বুঝি আসতে দিচ্ছিলেন না?

আমি হেসে বল্‌লুম — কেন আসতে দেবেন না? একবার বল্‌তেই বল্‌লেন—বেশ তো, যখন খুশী যেও।

—তা' তো বল্‌বেনই, উনি তোমাকে যে রকম ভালবাসেন—স্ত্রীকে কে-ই বা না ভালবাসে? এই দেখ ভাই, এইটী আমার ঘর, পাশের ওই বড় ঘরখানায় মা থাকেন। ছোট্ট বাংলো, ঘর বেশী নেই তো? বাবা নিরিবিলি থাকতে ভাল বাসেন, তাই……

ঘর জোড়া ম্যাটিং ও সতরঞ্চির উপর একখানা বড় গালিচার আসন পেতে দিয়ে রমা বল্‌লে—ব'স ভাই, আমি এ কাগজ-কলমগুলো তুলে রাখি, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে……

—চিঠি লিখছিলে বুঝি? কাকে? বরকে?

রমা খাটের উপর ছড়ান দোয়াত-কলম-প্যাড তুল্‌তে তুল্‌তে সলাজ ভঙ্গিতে মধুর হেসে বল্‌লে—ঠিক ধরেছ তো?—এবার বড্ড বকুনী খেয়েছি ভাই! অবশ্য চিঠি দিতে দেরী করার জন্যে, কি করি?…খোকনটী যা' হয়েছে—! চিঠি লিখতে বসলেই অমনি কাগজ ছিঁড়ে, কালি ফেলে একাকার ক'রে দেবে। মা'র কাছে দিয়ে এসেছি, তাই এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'য়ে লিখতে পারলুম—

—কিন্তু আমি যে বাধা দিলুম এসে—

—ও-মা, সে কি কথা! চিঠি লেখা তো আমার হ'য়ে গেছে, এই দেখ না?

রমা খামে-বন্ধ চিঠিখানা তুলে দেখালে, তার শিরোনামায় পলকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্লুম—তোমার স্বামী বুঝি ডাক্তার?

—হ্যাঁ, এই সবে ডাক্তারীর ছাপ নিয়ে বেরিয়েছেন, আমার শ্বশুরও পাটনার একজন বড় ডাক্তার।

—কি লিখলে বরকে?

—ও-মা! তা' এখন কি ক'রে বলি ভাই! বন্ধ না করলে চিঠিখানা তোমাকে দেখিয়ে দিতুম। হাসছ যে? সত্যি বল্‌ছি—ওতে লুকোবার আর কি আছে? সে যখন প্রথম প্রথম·········

—এখন বুড়ো হ'য়ে গেছ বুঝি?

রমা আমার কাছে ব'সে হাসতে হাসতে বল্‌লে—তা' মিথ্যে কি? ছেলের মা হ'লেই তো বুড়ো···এখন সব চিঠিতেই খালি ছেলের কথা—'খোকন কেমন আছে?'—'তাকে খুব সাবধানে রাখ্‌বে।'—'খোকনের জন্যে ভারি মন কেমন করে।'—এই সব···

—আর খোকনের মা'র জন্যে মন কেমন করে না?

—কি জানি! করে হয় তো অল্প-স্বল্প! তোমাদের মতো চকা-চকী হ'য়ে ব'সে থাকা অভ্যাস নেই তো!—

রমা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল। সে এত হাসি কোথায় পায় কে জানে!

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে, আমার একখানা হাত কোলে

টেনে চুড়ীগুলো নাড়তে নাড়তে রমা মুখখানি রাঙা ক'রে বল্লে—তা' তোমার কাছে মিথ্যে বল্‌ব না ভাই, আমাকে ও একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চায় না। ননদেরা কত ঠাট্টা করে, এই যে এখানে এসেছি, পাঠাতে কি চায় কিছুতে? নেহাৎ শ্বশুর বল্লেন খোকনের দাঁত ওঠার সময়, গরমের তিনটে মাস দেরাদুনে রাখলে ভাল হয়, তাই না আসতে পেলুম।

—কই? তোমার খোকনকে একবার আন না ভাই, একটু আদর করি—যার লোভে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।

—তাই না কি? ওর লোভে? আমার জন্যে নয়? আঃ গেল যা! 'খোকন-খোকন' ক'রেই সবাই অস্থির দেখি। ও হ'য়ে পর্য্যন্তই আমার আদর গেছে, শাশুড়ী আগে আমাকে কত আদর করতেন, এখন ছিষ্টিধর বংশধর নীলমণিকে নিয়ে ব্যস্ত······মা'র কাছে এলে মা'ও······ঐ দেখ না, আসছেন নীলমণি আমার!—ও-মা, কে এসেছে দেখ! সেই যে যা'র কথা তোমাকে কাল বলছিলুম—বড্ড ভাল মানুষ, এতটুকু গুমোর নেই, এত যে বড়-লোকের বউ······

আমি রমার মাকে প্রণাম ক'রে খোকনকে কোলে নিয়ে বল্লুম—হয়েছে! আর পরিচয় দেবার দরকার নেই তোমার!

রমার মা আশীর্ব্বাদ করতে করতে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে প্রসন্ন মুখে বল্লেন—বেশ, সুন্দর বউটী তো? কিন্তু এত রোগা কেন? তোমার কোন অসুখ-টসুখ আছে না কি মা?

মাথা নেড়ে বল্‌লুম—সেই জন্যেই তো দেরাদুনে আসা, এ দেশটা না কি স্বাস্থ্যকর।

—হ্যাঁ, এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল। কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে! ও-মা, ও কে গো? দাদুর সঙ্গে তোমার যে এরই মধ্যে খুব ভাব হ'য়ে গেছে দেখছি! বাঃ! কেমন মুখের পানে চেয়ে আছে চুপটি ক'রে! তুমি ছেলে বড় ভালবাস, না?

খোকনকে আদর করতে করতে আমি সলজ্জভাবে বল্লুম—বড় সুন্দর ছেলেটী! দেখলেই মায়া হয়।

—আহা! ও যে মায়ারই জিনিষ মা! তা' তোমারও তো হবার সময় হয়েছে, রোগের জন্যেই বুঝি......যাক্ ভাল হ'য়ে যাও, ভগবান্ তোমার কোলেও অমনি একটী দিন...আমার রমার খোকন হয় ষোল পেরিয়ে, তাতেই শ্বশুর-শাশুড়ী কি রকম অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন, ওঁদেরও তো ওই একটী ছেলে শিব-রাত্রির সল্তে—জামাইয়ের আর ভাই নেই কি না? কাজেই......নাতিটী হয়েছে এখন ওঁদের গলার হার। ওর পাছে কষ্ট হয়, অযত্ন হয় ব'লে পাঠাতেই চা'ন না। কিন্তু আমারও তো আদরের জিনিস, দু'দিন রাখতে, খাওয়াতে ইচ্ছে করে না কি?

রমার মা তারপর আরও কত গল্প করলেন, শ্বশুর-ঘরে রমার আদর কেমন, জামাইটীর রূপ-গুণের প্রশংসা, ছেলে দু'টীর পড়াশোনায় কত মন—খোকনের বুদ্ধির তারিফ, আমার এখানে কি রকম লাগছে—ইত্যাদি।

এই সব নানা কথার মধ্যে এক সময় তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ গা! এ কি! কপালে সিঁদুর দাও নি কেন? সিঁথিটা সাদা ফ্যাক্ ফ্যাক্ করছে যে! ছিঃ ছিঃ! আজকালকার মেয়েদের কি যে বুদ্ধি

হয়েছে। আন তো রমা, সিঁদুর-কৌটোটা······যা যা, হাঁ ক'রে দেখছিস কি?

আমার বুকটা দুর দুর ক'রে উঠল।

হায়! সিঁদুর পরতে আমার কত সাধ ছিল! সেই ছোটবেলা থেকেই, কিন্তু কেন যে পরি নি! পরতে কি দোষ ছিল? কিছু না—তবু কি যে এক সংস্কার মজ্জাগত হ'য়ে রয়েছে, কে হাসবে, কে কি মনে করবে—এই ক'রেই এতদিন কেটে গেল, উনিও তো মুখ ফুটে বলেন কি একবারও। ভাগ্যে আইবুড়ো বেলাকার 'নোয়া' গাছটা হাতে আছে!

রমা অবিলম্বে সিঁদুর-কৌটোটা মা'র হাতে দিয়ে মুখ টিপে হাসতে হাসতে বল্‌লে—এ যে তোমার অন্যায় মা! কেউ যদি এ সব পছন্দ না করে—মেমসায়েব বনতে যায়······

—রেখে দে তোর মেমসায়েব!

রমার মা আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে কপালে একটা কোঁটা দিয়ে চিবুক ধ'রে বল্‌লেন—দেখ তো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে এখন? এয়োস্ত্রী মানুষ, সিঁদুর না হ'লে কি মানায়? আর ওতে স্বামীর অকল্যাণ করা হয় যে! ঘরে শাশুড়ী-ননদ কেউ নেই, তাই······

কি যে বল্‌ব তাঁকে, ভেবে পেলুম না। বিশুর মা আমাকে নিতে এসে দেখি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে আছে!—মা গো! কি লজ্জা! কিন্তু এই লজ্জার দারুণ অস্বস্তির মধ্যেও কিসের একটা অভিনব মধুর অনুভূতি আমার বিপর্যস্ত চিত্তকে রাঙিয়ে তুলেছে ওই সিঁদুর রাগের মতো।

রাতের ফুল

এ কি! অ্যাঁ—এ কি গো?

বাড়ী এসে ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াতেই আমার ছায়া পড়ল সামনের আয়নায়। এ অপরূপ স্ত্রী-মূর্ত্তি আমার এতদিন কোথায় লুকানো ছিল?

মুগ্ধ-বিস্ময়ে আমি আরসীর মধ্যে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখছিলুম, দেখে যেন আশ মিটছিল না; সেই সময় উনি এসে উপস্থিত। আমার মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই উনি যেন চম্‌কে গেলেন—এ আবার কি?

কথাটা এমন ভাবে বল্‌লেন যে, আমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হ'ল। কাছে এসে টেবিলে ঠেস্ দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কালীবাড়ী গিয়েছিলে না কি? না? তবে যে......

ওঁর অসম্পূর্ণ প্রশ্নটা তীরের মতো আমার বুকে এসে লাগল, মাটির দিকে চোখ ক'রে মৃদুকম্পিত স্বরে বল্‌লুম—রমাদের বাড়ীতে গেছলুম, তাই—

—সে আবার কে?

—ওই যে ওধারে নীল বাংলোখানায় থাকে—উকীলের মেয়ে, যার কথা তোমাকে কাল......

—ও!

পাশের সোফাখানায় আধ-শোওয়া ভাবে ব'সে উনি রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। ওঁর ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল—আমার এ আয়ুষ্মতীর সৌভাগ্য-চিহ্ন ওঁকে আনন্দ দেয় নি।

লজ্জায়, অভিমানে মরমে ম'রে গিয়ে আমি ব'লে ফেললুম—

রমার মা-ই তো আমাকে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন, বারণ করতে পারলুম না—

—তা'তে কি হয়েছে? বেশ তো!

কথাটার সঙ্গে একটা কম্পমান গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে আমি চকিত হ'য়ে দেখলুম—ওঁর মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, মনে একটা আঘাত লেগেছে নিশ্চয়। কিন্তু আমার কি দোষ?

ইচ্ছে হ'ল তখুনি, ওঁর সামনেই সিঁদুরটুকু সব মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলি—হাত উঠল না। মনের ব্যথা মনে চেপে আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছিলুম······উনি ডেকে বললেন—শোন!

ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বলছ?

—বলছি, কোথায় যাচ্ছ? তোমার কোন কাজ আছে না কি?

—না, আমার আর কাজ কি? অমনি······

—তা' হ'লে চল না, আজ সিনেমা দেখে আসি। অবশ্য হিন্দী 'ফিল্ম', হিন্দী তো বুঝি জান, না?

—হ্যাঁ, কাশীতে যে স্কুলে পড়তুম, তাতে হিন্দীই তো ছিল আমাদের—

—ঠিক ঠিক! তা' হ'লে তুমি তো সবই বুঝতে পারবে, আমিও যতদূর পারি······কি জানি, কিছু ভাল লাগছে না যেন, একটু অন্যমনস্ক হ'লে হয়তো······

ইচ্ছে ছিল না আজ কোনখানে যেতে, কিন্তু ওঁর মুখ দেখে 'না' বলতে পারলুম না। ওঁর এ অশান্তির মূল কারণ তো আমিই—আমাকে নিয়েই তো ওঁর যত জ্বালা!

রাতের ফুল

*　　*　　*　　*

ছবি শেষ হবার আগেই চ'লে আসা হ'ল, তবু ফিরতে বারোটা বেজে গেল।

সন্ধ্যার ঘটনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, তখন ছায়াচিত্রের স্মরণীয় চিত্রগুলিই মনের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছিল। সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে কাপড় ছেড়ে শোবার ঘরে এসে দেখি, উনি আলোর দিকে চেয়ে বুকের উপর দু'টী হাত রেখে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন···

অমন ক'রে কি ভাবছেন? আবার কি? সেই লিলি? সে কি আর ভোলবার? এতদূরে—হাজার মাইল তফাতে এসেও লিলির চিন্তা, লিলির মোহ—না না—ভালবাসা—ওঁকে মর্ম্মপীড়িত করছে, তবে আর কেন? কেন আর বৃথা কষ্ট পাওয়া — কষ্ট দেওয়া?

বাস্তবিক—ওঁর মুখ-চোখের কাতর উন্মনা ভাব দেখে আমার এত কষ্ট হ'ল! এতদিন নিজের দুঃখকেই বড় মনে করেছি, স্বার্থপরের মতো, আর একটা মানুষ যে কি মনোকষ্ট ভোগ করছে তা' চেয়েও দেখি নি তো!

ব্যথিত হ'য়ে বললুম—রাত হ'ল যে—শোবে না? কাপড়-চোপড় ছেড়ে······

—তুমি শোও গে, আমি একটু পরে······একখানা চিঠি লিখে······

—এখন? এত রাতে?

—হ্যাঁ, দিনের বেলা মনেই ছিল না, বড় জরুরী চিঠি।

হুঁ! জরুরীই বটে! ভীষণ দরকারী! নইলে এই রাত দুপুরে···

এ দরকার এতদিন হয় নি যে এই আশ্চর্য্য! আর হ'লেও—আমি কি দেখতে গেছি?

আমার বিগলিত চিত্ত নিমেষে কঠিন হ'য়ে উঠল—আবার নূতন ক'রে একটা আঘাত পেয়ে······

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে শুয়ে পড়লুম। ঘুম এল না—কতক্ষণ, তবু গোয়েন্দাগিরি করতে প্রবৃত্তি হ'ল না।

সকাল বেলা উনি তখন ঘুমুচ্ছেন, কি একটা কাজে ড্রয়িং-রুমে গিয়ে টেবিলের উপর প্যাডের কাগজ ক'খানা ছেঁড়া প'ড়ে রয়েছে, একে ইংরাজীতে লেখা, তায় কুটি কুটি করা···বোঝবার উপায় নেই, তবে হস্তাক্ষর যে ওঁর সেটা ঠিক।

টেবিলের নীচে একখানা খাম দু'টুকরা ক'রে ফেলা হয়েছে, তুলে দেখলুম তাতে জ্যোতিষবাবুর নাম ও ঠিকানা।

তা' হ'লে আমি কি ভুল বুঝেছি? কিন্তু···বন্ধুকে চিঠি লেখা, তাতে এত ছেঁড়াছিঁড়ি করবার কি ছিল? যাই হোক্······

ওঁর অস্থিরতা যে দিনের দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা' বেশ বুঝতে পাচ্ছি, ও দিকে কলকাতায় যাবার নাম করলেই চ'টে যান, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। নিশ্চয়! কিন্তু—থাক্ গে, আর কিছু জানতে চাই নে, যা' জেনেছি তাই যথেষ্ট! একটুখানি ঝাপ্‌সা থাক, নইলে বুক ফেটে ম'রে যাব যে!

ভাগ্যে এ সময় রমাকে, খোকনকে পেয়েছিলুম। সরলা আনন্দ

রাতের ফুল

প্রতিমা রমা, দুঃখ তার কাছে ঘেঁষতে পারে না, সকলকেই সে নিজের মত সুখী মনে করে।

ভগবান্ তার সুখ-সৌভাগ্য অক্ষয় করুন! দু'দিনের আলাপেই ও যেন আমার কত আপনার হ'য়ে গেছে।

আর নন্দনের পারিজাত খোকন! ওকে বুকে নিলে আমি সব ভুলে যাই, বুভুক্ষু হৃদয় আমার সারাক্ষণই ব্যাকুল—উন্মুখ হ'য়ে থাকে ওর এতটুকু অমৃত-স্পর্শ পাবার জন্যে!

রমা তা' বোঝে, তাই আমি যেতে না পারলে ছেলেকে নিয়ে সে নিজেই আসে, কিম্বা ছোঁড়া-চাকরটার কোলে পাঠিয়ে দেয়। আমার এ দুর্ভাগ্যের জীবনে এখন সে-ই সান্ত্বনা।

সন্ধ্যেবেলা খোকনকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলুম। দু'ধারে রং বে-রংয়ের ফুলের গাছ। ছেলে যে ফুল দেখে, তাতেই ঝুঁকে পড়ে, 'ফুঃ ফুঃ' করে, কোলে ধ'রে রাখা দায়। তার ছোট দু'টী হাতে যত ফুল ধরে তা' দিয়ে দু'কানে দু'টী চাঁপা ফুল গুঁজে আদর করছি, পায়ের শব্দে ফিরে দেখি উনি!

আমার কাছে এগিয়ে এসে উনি হাসতে হাসতে বল্‌লেন—বা রে! আজ যে গণেশ-জননী রূপ! ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তো! কোথায় পেলে একে?

—এই তো রমার ছেলে, ক'দিনেই এমন নেওটো হ'য়ে গেছে আমার।

—সুন্দর ছেলেটী তো!

রাতের ফুল

খোকনের গাল দু'টী আদর ক'রে টিপে উনি স্মিতহাস্যে আবার বল্‌লেন—বেশ ছেলেটী, না?

আমার বুকের স্পন্দন যেন থেমে এল।

কতক্ষণ নিশ্চল নির্ব্বাক্ থেকে আমি যখন মুখ তুল্‌লুম, তখন উনি চ'লে গেছেন। ওঁর মনে কি হ'চ্ছিল……ভগবান জানেন!

রাত্রে উনি যখন বল্‌লেন—মুসৌরীতে বাড়ী নেওয়া হ'য়ে গেছে, তিন দিন থাকলেও তিন মাসের ভাড়া লাগবে, কাজেই এখন না গেলে……

তখন বুকের মাঝখানটায় আমার হাতুড়ীর ঘা পড়লেও আশ্চর্য্য হ'তুম না। এ তো ধরা কথা!

এ সুখটুকুও সইবে কেন?

হায় রে বিধাতা!

বিশুর মা'র কথা

পুরুষ মানুষের আবার ভালবাসা, লোকে যা' বলে তা' মিথ্যে নয়।

ও জাতটাকে বিশ্বেস করলেই ঠক্‌তে হয়। কি পণ্ডিত, কি মুখ্যু, কি গরীব, কি বড়লোক—সব এক ধাতে গড়া!

এই আমাদের বাবুর দেখ না—প্রথম যখন এ বাড়ীতে আমি আসি, আমিই কি জানতুম ছাই ভিতরের কথা? পরে শুনলুম

বেয়ারা শঙ্কুরের মুখে, ও ছোঁড়া বাবুর নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে। ভারি চালাক্ কিন্তু—ওর পেট থেকে কথা বার করা……

হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম? তখন এই বউরাণীর কি আদর, কি সোহাগ, কি রাম-রাজত্বি! দেখে মনে হ'ত, ও যেন মাটি দিয়ে হেঁটে গেলে বাবুর বুকে ব্যথা লাগে! এমনি ভাব, তারপর যেই আর একটী জুটল, ব্যস্!

আরে, এ তো জানা কথা, যে দিন ড্রাইভারের মুখে শুনলুম, বাবু কোন্ বারিষ্টারের মেয়েকে নিয়ে বায়স্কোপে গেছে, সে মেয়ে আবার সুন্দরী, তখনি তো বুঝেছি আমাদের বউরাণীর কপাল ভেঙ্গেছে। কিন্তু বোকা মেয়ে যে কিছুতে বোঝে না, ভাবে—বাবু বুঝি তার আঁচলের গিঁটেই বাঁধা আছে! হুঁঃ! তা কি আর থাকে রে পাগল! লোকে বিয়ে-করা ইস্তিরীকেই ভারি কেয়ার করে—এ তো হ'ল গে……

ঐ তো বল্‌লুম — ও জাতটাকে বিশ্বেস করাই ভুল। তারপর তোর অত নীচু, অত নরম হ'য়ে থাকা কেন রে বাপু? ওরা যে 'নাই' পেলে মাথায় চ'ড়ে বসে! একটু শাসন চাই।

কেন বিশুর বাপও তো ছিল — এম্‌নে 'ভেরিমেরি' করলে কি হয়, একটু কিছু দোষ ক'রে ফেল্‌লে মিন্সে নবমীর উচ্ছুগ্‌গু করা পাঁঠার মতো একেবারে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপত!

সেই যে…এখনো মনে পড়ে, সেবার…বিশু তখন পেটে, ছিদেম মণ্ডলের বিধবা ভাদ্দর বৌটার সঙ্গে পুকুর ঘাটে কি ফষ্টি-নষ্টি করছিল—দেখে কি শাস্তিই না দিলুম, গোটা দু'দিন খেতে দিই নি,

ঘরে ঢুক্‌তে পর্য্যন্ত···মিন্সেকে শুধু মারতে বাকি রেখেছিলুম···তাই ব'লে সোয়ামীর উপর আমার ভক্তি-ছেদ্দা কি কিছু কম ছিল গা?

বউরাণী যদি আমাদের একটু শক্ত হ'ত তা' হ'লে আজ কি এ দশা ঘটে? কেন বাপু? লোকে যে···তা' তার জন্যেও তো মাগ-ছেলে—সব ছেড়ে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কি না করছে? এ তো আর তা' নয়! ব্রাহ্মণ কন্যে, কুমারী···আবাগী মা-মাগী হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছে মরণ কালে—তার এই খোয়ার করা?

ওকে ত্যাগ করলে ও এখন দাঁড়ায় কোথা বল দেখি? তেমন চালাক-চতুর হ'লে ঘর-বাড়ী সব হাতের মুঠোয় ক'রে নিত এদ্দিন, তা' তো নয়। ও মেয়ে নিজের গুমোর নিয়েই ম'ল! মুখ ফুটে একটা কথা বল্‌বে না, কাঁদবে, তাও লুকিয়ে!

এমনি ধারা গুম্‌রে গুম্‌রেই তো দেহটা পাত হ'য়ে গেল ওর, ও কি আর সারবে? রামঃ!

ডাক্তার ডাকো, আর 'চেঞ্জে'ই আনো, মনের সুখই হ'ল আসল···এখনো বাবু যদি নিজে একটুকু যত্ন-আত্তি করে······তাই বা কই? কেমন বাইরে বাইরে ঘোরে, কখনো শিকার, কখনো কিছু। দেরাদুনে এতটা ছিল না তো, বউরাণীও সেখানে ছিল ভাল, এ পাহাড়ে এসে পর্য্যন্ত একটা দিনও ফাঁক্ যাচ্ছে না, বুকে ব্যথা তো আছেই, তার উপর আবার নিত্যি নতুন উপসগ্‌গ, ঝক্কি পোয়াতে হয় সব আমাকেই, বাবু তো ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ আনিয়েই খালাস।

আর তার নিজেরই মাথার ঠিক্ নেই, করে কি? সত্যি,

রাতের ফুল

আমার বাপু ভয় করে, যে রকম বাড়াবাড়ি করছে আজকাল, রাতে ঘুম নেই, দিনে আরাম নেই, সময়ে নাওয়া-খাওয়া নেই, টো-টো ক'রে বেড়াচ্ছে, কোথায় যায়, কি করে, কে জানে? কেউ আলাপী-সালাপীও তো নেই এখানে।

আবার বাড়ীতে থাকলেই কি স্বস্তি আছে ছাই, একটা না একটা ছুতো ধ'রে খিটি-মিটি···জ্বালাতন আর কি!

এমন খিট্-খিটে মেজাজ আগে তো কই দেখি নি! হ'য়ে পড়েছে গো! ভাবনা-চিন্তেয় মানুষকে কি না করে, সবাই সব সহ্য করতে পারে কি?

সেই মুখপোড়া ব্যারিষ্টার সাহেব না কি ব'লে দিয়েছে—বউরাণীকে কাশীতে বিদেয় ক'রে না এলে হবে না। ঐ শঙ্কুরেই বলে বাপু, সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন! কিন্তু তাই কি পারে মানুষ? হ্যাঁ গা, একটা বনের পাখী পুষলেও কত মায়া প'ড়ে যায়, আর এদ্দিন একত্তর থেকে, এত ভালবেসে, শেষে কি না একেবারে বিসজ্জন! আহা! ভারি মায়া হয় ওকে দেখে—অমন লক্ষ্মী পিরতিমেটী!

বাবুর শরীরেও তো দয়ামায়ার কম্‌তি দেখি নে, চাকর-বাকর সকলকেই কি রকম যত্ন···তবে আমার মনে হয়, বউরাণীর অসুখে অসুখেই উনি আরো তিতি-বিরিক্তি হ'য়ে পড়েছে। তাও বলি বাপু, এই উচাঙ্গা বয়স, ফুর্ত্তির সময়, এখন ও রকম ঘ্যান্-ঘ্যান্, প্যান্-প্যান্ ভাল লাগে কি? তাই কি এক-আধ দিন? মা—মা! নিত্যি লেগে আছে, আমাদেরই জ্বালাতন ধ'রে যায়।

তবে রোগ তো আর মানুষ নিজের ইচ্ছেয় করে না, অমন অস্থির হ'লে চলবে কেন? বিধাতা কপালে যা' লিখেছেন...

হ্যাঁ, বাবু আবার মদ ধরেছেন। আগেকার মতো ছিটে-ফোঁটা নয়—গেলাস্-গেলাস্! ওরা বলাবলি করে, তা' আমি বিশ্বেস করি নি, কিন্তু এই পরশু না তরশু সেই রাত দুপুরে মদ খেয়ে এসে কি কাণ্ডই না করলে, ইস্! এদ্দিন আর যাই হোক্—বউরাণীর মুখের উপর একটা উঁচু কথা বল্‌তে আমরা শুনি নি—সে দিন একেবারে যাচ্ছে-তাই—বেশ করছি, খুব করছি! তোমার কি? আমাকে ভাল-মন্দ বল্‌বার তুমি কে গো? কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন—

এ সব কি কথা! বউরাণী বেচারী শেষ কালে পায়ে ধ'রে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বল্‌লে—তোমার যা' খুশী তাই ক'রো, যাতে তুমি সুখী হও, কিন্তু এমন ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না গো! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি!

তখন বাবু পাগলের মতো হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন, বল্‌লেন—আমি সুখী হব? সে পথ তুমি রেখেছ না কি?

বউরাণীর মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেল। বাবুর পা ছেড়ে দিয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে পড়লো আর পাশ ফেরবার পর্য্যন্ত শক্তি রইল না। বুকের বেদনায় সারারাত ছটফটানি, কাকেই বা বলি? বাবু তো বেহুঁশ, শঙ্করে মাথায় বরফ দিয়ে সেই যে ঘুম পাড়িয়ে গেল, আর সাড়া-শব্দটী নেই।

মরতে এক ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমিই আছি! চৌপর

রাত ঠায় জেগে!—কখনো মালিস, কখনো সেঁক্, ও তো কেঁদেই আকুল, বলে—আর কিছু ক'রো না বিশুর মা! আমাকে ভরি খানেক আফিম এনে দাও শুধু, যত টাকা লাগে···সকল জ্বালার শান্তি হ'য়ে যাক্, উনিও বাঁচুন, আমিও বাঁচি!

আহা গো! বেচারীর কি কষ্ট দেখ দেখি! আত্মহত্যে কি মানুষ সাধে করতে চায়? নেহাৎ আর সইতে পারে না ব'লেই তো। সেই থেকে এমন ভয় ধ'রে গেছে আমার — আজ যেন আমাকে ঐ কথা বল্লে, কাল যদি পয়সার লোভ দেখিয়ে আর কাউকে দিয়ে আফিম আনিয়ে খায়···

মা-গো! কথাটা মনে করতেও গা শিউরে ওঠে যেন! শেষে আমাকেই নিয়ে টানা-ছেঁড়া করুক আর কি! থানা, পুলিস—না বাবা, ঝক্‌মারী করেছিলুম, বড়লোকের বাড়ী কাজ করতে এসে, দূর! দূর! এবার কল্‌কেতায় গিয়েই এ চাকরি ছেড়ে দেব। এ বিদেশ বিভূঁইতে কি আর করি, কাকেই বা বলি? মনিবেরই যখন হুঁশ নেই, আর ওঁরই বা জীবনের ঠিক কি? যে রকম বাড়াবাড়ি করছেন, শরীর আর কদ্দিন টিকবে? এরই মধ্যে চোখের কোল ব'সে গেছে, অমন যে কাঁচা সোনার মতো রঙ্······ কোন্ দিন মাতাল হ'য়ে পাহাড়ের 'খাদে' প'ড়ে গেলেই তো চিত্তির!

কে জানে বাপু! কবে কি একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হ'য়ে পড়ে, সর্ব্বদাই ভয়ে কাঁটা হ'য়ে আছি। এর চাইতে বাবু যদি এ ছুঁড়ীর একটা ভালমত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সেই ব্যারিষ্টারের

মেয়েকেই ঘরে আনে, তা' হ'লে বোধ হয়······থাক্ গে, কাজ কি আমাদের, কথায় বলে, বড় ঘরের বড় কথা! শস্কুরে ছোঁড়াকে তাই তো বলি, গরীবের ছেলে গতর খাটিয়ে খেতে এসেছিস, তোর ওসব চচ্চায় থাক্‌বার দরকার কি রে বাপ্? আরে আমার মুখ থেকেও কি একটা কথা বেরোতো? কক্ষণো না, কেটে ফেল্‌লেও না! কিন্তু কি করি বলো? বড় আপসোস হয় ওই আবাগীর জন্যে। এই যে ঘর-দোর ছেড়ে মগের মুল্লুকে এসেছি, ওর মায়াতেই বদ্ধ হ'য়ে না? কিন্তু ঢের হয়েছে, আর নয়, এই দু'টো কান ধর্‌ছি, হরির দয়ায় একবার কল্‌কেতায় গিয়ে পড়লে হয়! বড় লোকের চাকরি আমার মাথায় থাক্!

পবিত্রর কথা

নাঃ, আর তো পারা যায় না!

দিন-রাত, অষ্ট প্রহর, মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ক'রে একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, সমস্ত বুকখানা আমার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হ'য়ে পড়েছে। তবু এ সংগ্রামের আর বিরাম নেই! বিরাম নেই!

এতদিন সহ্য করেছি, কিন্তু আর শক্তি নেই, আর পারছি নে নিজেকে সাম্‌লে রাখতে, ক্ষুব্ধ উত্যক্ত চিত্ত বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছে দিনে দিনে, বাস্তবিক কি যে করি!

এক এক সময় ভাবি—থাক্ রজনী, থাক্ লিপি, জীবনটাকে

রাতের ফুল

উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যাই যে দিকে নিয়ে যায়। তখুনি মনে পড়ে লিলির বিদায়-ক্ষণের শিশির-ভেজা প্রভাত-পদ্মের মতো অশ্রু-সজল সেই সুন্দর মুখখানি, কি তার সে কাতর মিনতি—আমাকে ভুলো না, তোমায় না পেলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, জেনো—

আঃ! সে কি ভোলা যায়? কত যত্ন, কত চেষ্টাই না করছি তাকে এক মুহূর্ত্ত ভুলে থাকবার জন্যে—পারছি কই? তার স্মৃতি যে আমার মনে-প্রাণে, চিন্তায়-ধ্যানে, শয়নে-স্বপনে অহরহই জেগে রয়েছে, তাই না আজ এই দশা!

লিলিকে একখানা চিঠি লিখে যে মনের আবেগ শান্ত করব, সে পথও বন্ধ। জ্যোতিষদা'কে চিঠি দিলে তার খবরটা অন্ততঃ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাহস হয় না, আমার এ দুর্ব্বলতা যদি ধরা প'ড়ে যায়! লিলির পিতা বড় শক্ত লোক, তাঁর কথার এতটুকু খেলাপ হবার জো নেই, যা' বলেন, তাই করেন, কাজেই···

আমার এখানকার অবস্থা ঠিক রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত প্রিয়া-বিরহ-বিধুর যক্ষের মতো, সে তবু তার বিরহ-বেদনার মাধুর্য্যটুকু নির্ব্বিবাদে উপভোগ করবার অবকাশ পেয়েছিল, আমার যে তাও নেই!—ওই যে রজনী···

নির্ব্বাসনের আর এক মাস বারো দিন বাকি। এখন একটা দিন যেন এক যুগ ব'লে মনে হয়, যাক্, কেটেই যাবে, এত দিন কেটেছে যখন···

কিন্তু তারপর ?

এই 'তারপরে'র ভাবনাই তো আমাকে আরও পাগল ক'রে তুলেছে, অনিশ্চিত হ'লেও লিলিকে আমি পাব, এ আমার স্থির বিশ্বাস, কিন্তু রজনী—ওর মুখের পানে যে চোখ তুলে চাইতে পারি নে! ও যখন সংশয়াকুল অতলস্পর্শী দৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকিয়ে থাকে, তখন আমার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়!

এতটুকু আদর পাবার জন্তে রজনীর কি ব্যাকুলতা! কিন্তু আদর করতে গেলেই কে যেন পিঠের উপর সপাং ক'রে চাবুক মারে!

তাই তো স'রে স'রে থাকি ডাক্তারের দোহাই দিয়ে।

আমার এ ছলনা সে বোঝে না, কিম্বা বুঝেও বুঝতে চায় না—কে জানে!

মনটা এমন খিঁচড়ে আছে যে, আজকাল রজনীকে অতর্কিতে কথায় কথায় আঘাত দিয়ে ফেলি, সে আঘাত ও বুক পেতে নেয় নীরবে, ব্যথায় মুখ বিবর্ণ হ'য়ে যায়, অভিমানে চোখ দু'টী ছলছলিয়ে ওঠে, তবু এতটুকু অনুযোগ নেই—আশ্চর্য্য…

সে দিন মদের নেশায় বেহুঁশ হ'য়ে রজনীকে যা' না বল্‌বার, তাই বলেছিলুম না কি, তারই জন্তে অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা চাইতে গেলুম, তখনো, একটী রূঢ় বাক্যও তার মুখ থেকে বা'র হ'ল না, শুধু—তুমি নিজের জীবনটাকে নিয়ে এ রকম হেলা-ফেলা ক'রো না!—ব'লেই আমার হাতখানা নিজের মুখে চেপে কাঁদতে লাগল। ঐ তো হয়েছে মুস্কিল! রজনী যদি সাধারণ মেয়েদের মতো নিজের

দাবী জানিয়ে ঝগড়া করত — তা' হ'লে ওর মায়া কাটানো এত কঠিন হ'য়ে উঠত না।

কিন্তু ওর এই ব্যথা-ভরা মুখ, মমতা-ভরা চোখের জল— আমার অন্তরকে গলিয়ে দেয়…

রজনীর শরীর 'চেঞ্জে' এসে যেটুকু ভাল হয়েছিল — এখন তার চেয়ে ঢের বেশী খারাপ হ'য়ে গেছে, সে জন্যে দুঃখ করা আমার পক্ষে…কি বল্‌ব?—সে দিন শিকারে গিয়ে কতকগুলো পাখী শিকার করেছিলুম, একটা পাখীর ঠিক্ বুকের মাঝখানটীতে গুলী লেগেছিল— কি রকম তার ধড়ফড়ানি!

আজ-কাল রজনী যখন বুকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, তখন সেই দৃশ্যই মনে প'ড়ে যায়, এও তো আমার এক শিকার! ওঃ!

এখানকার দু'জন ভাল ডাক্তারকে দেখানো হ'ল, তাঁদের মতে রজনীর রোগ আরোগ্যের আশা প্রায় দুরাশা—যতদিন ভোগ আছে, তা' দু'মাসও হ'তে পারে, দু'বছরও……ঠিক ক'রে বলা যায় না।

কথাটা গোপন রেখেছি রজনীর কাছে, ও ব্যথা হিষ্টিরিয়ারই একটা উপসর্গ ব'লে সে বিশ্বাস করেছে কি না জানি নে, তবে প্রতিবাদ করে নি, প্রতিবাদ সে কখনও করে না।

নির্ব্বাসন—মুক্তি আসন্ন! কি যে করব? এখন পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্যই স্থির করা হ'ল না—কবে আর হবে?

আজ শেষ দিন। এই তিন মাসের এক একটী দিন, এক

একটী মুহূর্ত্ত হিসাব করা আমার ভুল হ'তে পারে না। মনে করলে আজই আমি ফিরতে পারি, কিন্তু··· আঃ! এ 'কিন্তু'কে ঠেকিয়ে রাখি কেমন ক'রে ?

বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বিভ্রান্ত মন নিয়ে বসেছিলুম দোতলার বারান্দায়—সকালে খুব খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, এখন পাহাড়ে পাহাড়ে আলো-ছায়ায় লুকোচুরি খেলা চলছে, আমার মনের মতোই···

বারান্দার ধারে কাঠের টবে-বসানো ডালিয়া গাছে লাল, গোলাপী রংয়ের ডালিয়া ফুলগুলি বৃষ্টির জলে ভিজে নত হ'য়ে পড়েছে, অভিমানিনী সুন্দরীর অশ্রু-সজল ঢল ঢল মুখখানির মতো! এমনি একখানি মুখ আমার বুকের মধ্যে বার বার······হায়! সে মুখ আবার দেখ্‌তে পাব আমি, কবে কত দিনে? মন যে আর ধৈর্য্য মানে না। লিলি, আমার প্রিয়তমা লিলি। তোমাকে আমি আর কতদিনে···

ঠুন্ ক'রে কি একটু শব্দ হ'ল, চোখ ফিরিয়ে দেখি রজনী—খানিক তফাতে কাঠের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আপন-ভোলা উদাস দৃষ্টি তা'র সুদূর দিগন্তে নিবদ্ধ। মৌন পাণ্ডুর মুখখানি কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মান চাঁদের মতো নিষ্প্রভ।

সেই উদাসিনী স্তব্ধ নারী-মূর্ত্তির পানে চেয়ে আমার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত করুণায় ভ'রে গেল, ডাক্‌লুম—রজনী! একলাটী ওখানে কেন? এদিকে এসো, আমার কাছে।

রজনী ধীরে এসে আমার পাশের ক্যাম্প্ চেয়ারখানায় বসল, কোমল কণ্ঠে বল্‌লুম—এখন শরীরটা তোমার কেমন লাগছে?

—ভালই।

আমি একটু হেসে বল্লুম—তোমার তো ঐ একই জবাব—'ভালই'।

—আর কি বল্ব! ভাল হবার যা'র আশা নেই···

—কে বল্লে? তোমার হয়েছে কি?—জ্বর-টর কিছু নেই, শুধু বুকের বেদনা—ও কিছু নয়, মাস্কুলার ·পেন্—ডাক্তার তাই তো মালিস করতে বলেন। তুমি শীগ্‌গির সেরে ওঠো রোজি!··· এমন ক'রে বাড়ী ছাড়া হ'য়ে আর কদ্দিন······

রজনীর চেহারা একেবারে পাংশু হ'য়ে গেল, চোখের পাতা নেমে পড়ল, পাতলা ঠোঁট দু'খানি বাসি-ফুলের পাপ্‌ড়ির মতো কাঁপতে লাগল।

আর আমার ভরসা হ'ল না কথা বল্তে, কি জানি রজনীকে যদি আবার ব্যথা দিয়ে ফেলি। দু'জনেই নীরব, সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে রজনী বল্লে—তুমি রাগ করো বল্‌লে, কিন্তু আমি তোমায় কবে থেকেই বল্‌ছি এবার ফেরো······

—ফেরা যায় কি ক'রে? তোমার দিকেও তো চাইতে হয়, যা'র জন্যে এতদূর আসা—

—আমার জন্যে?

রজনীর বিরস অধরে চকিতে হাসির ঝিলিক্ খেলে গেল, ছুরির ফলার মত শাণিত তীব্র সে হাসি! আমি তা'র দিকে চাইতে পারলুম না আর। রজনী একটু কেসে বাধ-বাধ ভাবে বল্‌লে—যাই হোক্ ফিরে চলো এবার, এমন ক'রে সব ছেড়ে-ছুড়ে রোগিণীর

সঙ্গে রোগা হ'য়ে আর কদ্দিন থাকতে পারে মানুষ! আমার জন্যে ভাবনা কি?…কত আশ্রম……হাসপাতাল…

রজনীর শেষ কথাটা আমাকে বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত ক'রে দিলে। কতক্ষণ পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে দেখি, রজনী সেখান থেকে উঠে গেছে।

সে দিন ঘরে থাকতে আর সাহস হ'ল না, শিকারের ছুতো করে বেরিয়ে পড়লুম। সারাদিনটা নিরুদ্দেশ ভ্রমণে কাটিয়ে শ্রান্ত দেহ-মন নিয়ে বাসায় ফিরছি, পিয়ন 'টেলিগ্রাম' দিয়ে গেল।

কে দিলে 'টেলিগ্রাম'? জ্যোতিষদা' না কি!—কম্পিত বক্ষে, কম্পিত করে, খামখানা খুলে দেখি পত্র-প্রেরক আর কেউ নয়—লিলি। লিখেছে—

"প্রতীক্ষা করছি, কবে আসছ?"

আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাস নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল দ্রুত তালে। বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল—লিলি সত্যিই আমাকে ভোলে নি! সে আমার মতোই অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করছে……

কাগজটুকু বুকে চেপে ধরলুম। গভীর আবেগে তার উন্মাদনাময় মধুর স্পর্শ তীব্র মদিরার মতো আমাকে মত্ত মাতাল ক'রে তুললে।

অনুতাপ, গ্লানি, দ্বিধা, সংশয়—কিছুই আর মনে নেই। ভারাক্রান্ত চিত্ত আমার যেন দখিন বাতাসের মতো হাল্‌কা হ'য়ে গেল। আজ মর্ম্ম-বীণায় গভীর সুরে বেজে উঠছে লিলির সেই গানখানি—

রাতের ফুল

"আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি
বল্‌তে দাও হে! বল্‌তে দাও!"

আঃ! নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারি নে আজ, হৃদয়-পেয়ালা আমার কানায় কানায় ভ'রে উপ্‌চে পড়ে যে!

কিন্তু...

হায়, রজনী!...

রজনীর শেষ কথা

বিশুর মা এসেছিল দুধ নিয়ে। আর ভাল লাগে না ছাই!

আমি বালিশে মুখ গুঁজড়ে বল্‌লুম—দুধ এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দাও গে, খেতে ইচ্ছে নেই।

রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল, সেটা ঘুম অথবা ইন্‌জেক্‌শানের দরুণ আচ্ছন্ন ভাবও হ'তে পারে।

সকালবেলা চোখ খুলতেই দেখি উনি আমার পাশে ব'সে আছেন। আমার গায়ে হাত দিয়ে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন — কেমন আছ রোজি? রাত্তিরে তো বেশ ঘুমিয়েছিলে, আমি দু'বার এসে দেখে গেছি।

সে ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে আমি রোজকার মতো 'ভাল আছি' বল্‌তে পারলুম না। কেমন ক'রে বলি গো? ভাল জ্বালা হয়েছে! ওঁর কিন্তু...

রাতের ফুল

এমন রাগ হ'চ্ছিল আমার নিজের উপর! কোথায় আশা করেছিলুম রোগের অবসাদ, সারারাত অনাহার, অতিরিক্ত দুর্ব্বলতায় হয়তো রাতারাতি হার্ট-ফেল করব, কিম্বা অতটা না হ'লেও অন্ততঃ অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে থাকব, তা' নয়, দিব্যি টন্‌-টনে জ্ঞান নিয়ে আবার 'ভাল আছি' বল্‌তে হবে!

একেই তো ভাল থাকা বলে!

কি অধর্ম্মের ভোগ আমার!

আমার নীরবতায় উনি হাতখানা সরিয়ে নিয়ে একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, তা' হ'লে আজও যেতে পারবে না—অ্যাঁ? কিন্তু…

কি গভীর হতাশা, তাঁর কথার সুরে!

—হ্যাঁ, পারবো বই কি?

আমি উত্তেজনার ঝোঁকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। গা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করছিল, মাথা ঘুরছিল, তবু জোর ক'রে উঠে, সমস্ত গ্লানি-অবসাদ জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে বল্‌লুম—না পারলে তো চলবে না, আজ যে যেতেই হবে! খুব পারবো, চল।

আমার মুখের পানে তাকিয়ে উনি একটু থতমত খেয়ে বল্‌লেন—না, তা' কেন? তোমার যদি কষ্ট হয় যেতে, তা' হ'লে……ঐ যে গাড়ী রিজার্ভ করা হ'য়ে গেছে কি না—সেই হয়েছে মুস্কিল, তবে নেহাৎ যদি না পারো—

—কেন পারবো না? খুব পারবো! খুব পারবো!

কথাটা বল্‌তে বল্‌তে আমি খাট থেকে নামছিলাম, উনি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন—উঠো না, উঠো না—আহা! অত ব্যস্ত হ'চ্ছ

কেন? এখনো ঢের সময় আছে। বেশ ধীরে-সুস্থে, খাওয়া-দাওয়া ক'রে বেরোলেই হবে, যা' দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ! ভয় করে, এতখানি পথ, কি ক'রে যে···শেষে কি······

—কিসের ভয়? আমার আর কিচ্ছু হবে না, এততেও কিছু হ'ল না যখন······

কথাটার মর্ম্ম যেন একেবারেই বোঝেন নি, এমনি ভাবে—তা' হ'লে বিশুর মাকে পাঠিয়ে দিই গে, এই বেলা হাত-মুখ ধুয়ে তুমি 'এগ-ক্লিপ্'টা আগে খেয়ে নাও, তারপর—

বল্‌তে বল্‌তে উনি চ'লে গেলেন।

কিন্তু বিশুর মাকে ডেকে দিতে কিম্বা পাশ কাটাবার জন্যে—তা' কি আমি এতটুকুও বুঝি নে? আমায় কি মনে করেন······

বাস্তবিক আমারও কিছু হ'ল না, কোনো বাধাই আর পড়ল না। বেশ চ'লে এলাম।

আবার সেই কল্‌কাতায়, সেই আমার ভ্রষ্ট স্বর্গে ফিরে আসতে হ'ল। অনধিকার প্রবেশের দুঃসহ লজ্জা, বেদনা ও ক্ষোভ নিয়ে আজ যেন আমি কত অপরাধী!

সঙ্কোচে নেমে-পড়া চোখের পাতা দু'খানি জোর ক'রে তুলে দেখলুম, ওঁর সে প্রফুল্লতা আর নেই, মুখে-চোখে কেমন যেন উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন ভাব, কেন? উনি একলা ফির্‌তে পারলেই বেশ ভাল হ'ত না?···

হায় রে! মানুষের মৃত্যু যদি নিজের ইচ্ছাধীন হ'ত?···

জিনিষ-পত্র তখনো সব খোলা হয় নি। স্নান ক'রে এসে দেখি,

রাতের ফুল

উনি বেরোবার জন্যে প্রস্তুত! এসে পর্য্যন্তই ছট্-ফট্ করছিলেন—সম্ভব হ'লে হয়তো ষ্টেশন থেকেই সোজা চ'লে যেতেন। আমি বাধা দেব না মনে ক'রেও হঠাৎ ব'লে ফেললুম — তুমি বেরোচ্ছ না কি?

—হ্যাঁ, কেন?

—এত বেলায় একেবারে খেয়ে-দেয়ে বেরুলেই তো···

—খাব 'খন — এত তাড়া কিসের?

না তাড়া কেন? যত তাড়া তোমার লিলির—

উদ্যত-রসনা সংযত ক'রে চ'লে এলুম।

খানিক বাদেই শুনলুম বিশুর মা বল্‌ছে — ঘর ঝাড়া এখন থাক্ না শঙ্কর! বাবু ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছেন? তবে কি উনি এখনো যান নি? কথাটা বিশ্বাস হ'ল না, তাই চুপি-চুপি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, উনি ড্রয়িং-রুমে সোফার উপর চোখ বুজিয়ে শুয়ে, হয়তো সত্যিই ঘুমিয়েছেন।

রিজার্ভ-গাড়ীতে এলেও পথে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বই কি? মনে-মনে যেখানে এত ডাকা-ডাকি, সেখানে কি আর ঘুম আসে!

পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, উনি ডাকলেন—শোনো!

ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলুম—কই? তুমি গেলে না?

—কোথায়?

সে ন্যাকামোর কথা শুনে গা জ্ব'লে গেল! ইচ্ছা হ'ল বলি—যেখানে যাবার জন্যে প্রাণটা ছট্-ফট্ করছে—

কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌লুম—তা' কি ক'রে বল্‌ব? তখন তাড়াতাড়ি ক'রে যাচ্ছিলে তাই।

—যাচ্ছিলুম তো! কিন্তু······আঃ, যাবার কি জো আছে ছাই?

আবার! আবার সেই প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তরে এতদিন আমি চুপ ক'রেই থেকেছি, কিন্তু আজ আর তা' হবে না, ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া দরকার—কিন্তু কি বলি? কেমন ক'রে বলি?

আমার মুখের পানে চেয়ে উনি যেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে কুণ্ঠার সঙ্গে বল্‌লেন—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো! পথে তো তেমন কষ্ট কিছু হয় নি? কেবল গরমের জন্যে······

বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠ্‌ল তীব্র শব্দে, সে শব্দ আমাদের 'কারে'র নয়। কে এলো?

উনি সচকিত হ'য়ে শশব্যস্তে উঠে সার্টটা গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে গেলেন দেখতে।

কে আসবে আবার? সেই···না এসে কি থাকতে পারে গা? এ যে প্রাণের টান! এখন আর সঙ্কোচ করবার কিছু নেই! এখন তো রাস্তা খোলা!

আমি অভ্যাগতার জন্যে ড্রয়িং-রুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে পালিয়ে এলুম, কৌতূহল হ'চ্ছিল দেখবার জন্যে খুবই, কিন্তু সাহস হ'ল না, কি জানি মানুষের মন, যদি সহ্য করতে না পারি!

অচিরে সাম্‌নের করাইডারে হিল্‌ওয়ালা জুতোর খট্‌-খট্‌ শব্দ এবং

মেয়েলী-গলার শব্দ শোনা গেল। করাইডারের ওধারে ড্রয়িং-রুম, এ ধারে আমার শয়ন-ঘর।

আড়াল থেকে শুধু একবারটী দেখব ব'লে আমি সে দিক্‌কার দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক দরজার পর্দ্দা তুলে একেবারে আমার সাম্‌নে, এ কি? এ যে মাসিমা!

আমার দিকে তাকিয়ে মাসিমা থম্‌কে ব'লে উঠলেন—আরে! রজনী যে!—তবে না শুনলুম···হ্যাঁ, খোকন?—

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি শশব্যস্তে — ও ঘরে না, মাসিমা! রজনীর শরীর বড় খারাপ। এদিকে ড্রয়িং-রুমে আসুন!—বলে, মাসিমার হাত ধ'রে প্রায় টেনেই নিয়ে গেলেন।

আমি স্তম্ভিত, হতবাক্‌! এ বাড়ীতে আমার আসা পর্য্যন্ত মাসিমা একদিনও পদার্পণ করেন নি, তবু তাঁর আজকের আসাটা তেমন বিস্ময়কর নয়, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তিনি এমন কি শুনেছেন, যা'তে আমায় দেখামাত্র চম্‌কে উঠলেন?

আমার মৃত্যু, না পরিবর্জ্জন?

জানবার জন্যে মন তখন এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে আমাকে বাধ্য হ'য়ে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হ'ল।

বিমূঢ়-ভাব কাটিয়ে আস্তে আস্তে আমি করাইডারে এসে দেখলুম — ড্রয়িং-রুমের এ ধারের দরজা ভেজানো রয়েছে আল্‌গা ভাবে, তার ফাঁক দিয়ে ভিতরের পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে কতক কতক।

আমি ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো কম্পিত চরণে, স্পন্দমান-বক্ষে সেই দরজার কাছে গিয়ে কান পাতলুম।

মাসিমা চাপা-গলায় বলছেন—এঃ! তুমি যে এত বোকা ছেলে বাবা, তা' তো জানতুম না! কোথায় মনে করছি যে, একেবারে আপদ বিদেয় ক'রে আসবে তা' নয়! সত্যি, এদ্দিনেও একটা হেস্ত-নেস্ত করতে পারলে না!

উনি এ কথার উত্তরে আরো আস্তে, মৃদু-কুণ্ঠিতস্বরে বললেন—এ কি আর অমনি বললেই পারা যায় মাসিমা? মানুষের প্রাণ তো? ও যে-রকম কাতর হ'য়ে পড়েছে……

আহা! কাতর সে-ও কি আর হয় নি? দেখলে বুঝতে বেচারী কি ক'রে যে দিন কাটাচ্ছে, সুজাতা সে দিন দেখে এসে কত দুঃখ করছিল। যাক্, এখন কি-রকম ব্যবস্থা করা যায় বলো তো?

—কি জানি মাসিমা, আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, এ যে কি বিষম সমস্যা…এত ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারছি নে।

—তা' তো বটেই, আচ্ছা, পুরীতে তোমাদের একখানা বাড়ী আছে না? ওকে যদি সেখানে…

—তা' স্বচ্ছন্দে হ'তে পারে, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জী যে চান ওর সঙ্গে আমি এতটুকু কোন সংশ্রবও না রাখি, সেই হয়েছে মুস্কিল!

—তা' হ'লে একটা কাজ করলে হয় না?

—কি?……

এর পরে ওঁরা এত আস্তে কথা বলতে লাগলেন যে, কিছুই বোঝা গেল না। বোঝাবুঝির দরকারও ছিল না আর, যা' শুনলুম তা'ই যথেষ্ট!

রাতের ফুল

আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল, গা কাঁপতে লাগল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এবার বন্ধ হ'য়ে যায় বুঝি! কোনমতে সাম্‌লে নিয়ে টল্‌তে-টল্‌তে এসে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লুম উপুড় হ'য়ে, আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো তখন অবশ, অসাড় হ'য়ে যাচ্ছিল, যেন মূর্চ্ছাহতের মতো।

—বউরাণী! ঘুমুলে না কি গা?

কতক্ষণ পরে কি জানি বিশুর মা'র ডাকে সেই মূর্চ্ছাপন্ন-ভাব থেকে জেগে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুয়ে বল্‌লুম — না!

—তা' হ'লে ওঠো, ঠাকুর ভাত দিয়েছে যে।

—উনি···

—বাবু তো মাসিমার সঙ্গে গেছেন, তাঁদের বাড়ীতেই খাবেন। বল্‌লেন, ওনার জন্যে অপেক্ষা না করতে।

—তা' হ'লে তোমরা খেয়ে নাও গে, আমার ক্ষিদে নেই।

—ও-মা! সে কি কথা? কাল থেকে পেটে অন্ন পড়ে নি, আর কিছু না হোক্‌ দু'টী মাছের ঝোল ভাত···

—না!

—তা' হ'লে ফল-টল কিছু···

—থাক্‌, আমাকে বিরক্ত ক'রো না বিশুর মা! শরীরটা বড় খারাপ লাগছে—

—শরীরের অপরাধ কি? এমন ক'রে না খেয়ে শুকিয়ে থাক্‌লে শরীর থাকে কি ক'রে মা?

রাতের ফুল

দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেলও যায়, ওঁর এখনো দেখা নেই। আজ ষড়যন্ত্রটা ভাল মতোই হ'চ্ছে আর কি। একটী অসহায়া অবলার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে ··· কিন্তু কিছুই আর করতে হবে না গো! সে তোমাদের সুখের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে আপনিই স'রে যাবে এবার। বাস্তবিক আর দেরী করা চল্‌বে না, আজই নিশুতি গভীর রাতে, যে দিকে দু'চোখ যায়···কিন্তু ওঁকে ছেড়ে···না, না, সে আমি পারব না! ওঁকে ছেড়ে প্রাণ থাক্‌তে আমি······

শঙ্কর এসে বল্‌লে—মা, বাবু মোটর চেয়ে পাঠিয়েছেন, আর বলেছেন, তাঁর আসতে রাত হ'তে পারে, এ বেলাও তাঁর জন্যে খাবার যেন না করা হয়।

কথাটা যেন তীরের মতো এসে বুকে লাগল। বেশ তো! এসে আর কাজ নেই! থাকুন তিনি তাঁর লিলিকে নিয়ে, সুখেই থাকুন! আমি কোথাকার কে যে, আমার জন্যে ··· নাঃ, দরকার নেই, আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নেব এ অবিচ্ছেদ্য মোহপাশ সবলে ছিন্ন ক'রে। এক ফোঁটা চোখের জলও আর ফেলব না! কেন? আমার নারীত্ব কি এতই অবহেলার জিনিষ? এ লাঞ্ছিত জীবনের বাস্তবিকই কি কোনো মূল্যই নেই?

থাক্, এ কেঁদে মান, যেচে সোহাগ, আর না, ঢের হয়েছে! এবার আমি মুক্তি চাই, শুধু মুক্তি!

চোখ-ভরা অশ্রুর উচ্ছ্বাস কষ্টে রোধ ক'রে আমি গায়ের গহনাগুলো একে একে খুলে আলমারিতে রেখে দিলুম। কেবল দু'গাছি চুড়ী হাতে রইল। কি হবে আর জঞ্জাল ব'য়ে?

বিশুর মা ঘরে এসে হঠাৎ আমার নিরাভরণা মূর্ত্তি দেখে সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ল — ও-মা এ কি! হার-টার গুলো কি করলে?

—খুলে রাখলুম, কষ্ট হয় পরতে—

—গয়না পরতে কষ্ট হয়? এ যে অনাছিষ্টি কথা বাপু!

অনাছিষ্টি হ'লেও সত্যি সত্যি কষ্ট বোধ হ'চ্ছিল। ও গুলো আমার গায়ে এখন কাঁটার মতো ফোটে যেন! আমি কি হীরে-মোত্তির কাঙাল? কিছুই চাই নে, রিক্ত নিঃস্ব হ'য়ে আমি সব ছেড়ে, সব ফেলে চ'লে যাব কিন্তু···আমার স্মৃতির পাতা থেকে এই দেড়টা বছর যদি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারতুম, এখানকারটা এইখানেই, ঐ গহনা গুলোর মতো···তা' কি হয় না?

আঃ! আবার! এ পোড়া চোখের জল কিছুতেই বারণ মানে না যে! যতই মুছি ততই···এ যেন অফুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। বুকের ভিতর কি রকম যেন টন্‌-টন্‌ করছে! আবার সেই বেদনা, উঃ! মাগো! আর যে পারি নে! দু'হাতে বুক চেপে পরিত্যক্ত শয্যায় আবার লুটিয়ে পড়লুম — হে ভগবান! এই শোওয়াই যেন আমার শেষ শোওয়া হয়, আর যেন উঠতে না হয় আমাকে!

বিশুর মা বল্‌লে—শঙ্করকে বলি, ডাক্তার বাবুকে একবারটী···

—না, কি করবে ডাক্তার?

—তা' হ'লে সেই ওষুধটাই একবার খাও···

—থাক্‌ গে! কিছুই হয় না ওতে।

বিশুর মা ছাড়ে না, মিনিট কতক বাদেই সে আবার এসে

বল্‌লে—সোজা হ'য়ে শোও দেখি, এই তেলটা একটু মালিশ ক'রে দিই, তা' হ'লে ব্যথাটা নরম প'ড়ে যাবে।

—থাক্—আপনিই কম্‌বে …

—থাক্ তবে! ওষুধ খাবে না, পথ্যি করবে না, এ যে জেনে শুনে, ইচ্ছে ক'রে আত্মহত্যে করা মা।…

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা! বেশ কথাটী তো!

আশ্চর্য্য! ব্যথাটা আজ সত্যি সত্যি আপনিই ক'মে গেল—খুব শীগ্‌গির! কায়মনে মৃত্যু কামনা করছি ব'লেই কি? খানিক পরে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়লুম। তখন আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে শুধু ঘুরছিল ওই একটী শব্দ—'আত্মহত্যা'! ঐ যে বিশুর মা ব'লে গেল, এখনি তাই করলে হয় না? এ্যাঁ! তা' হ'লে……ওঁদের সেই লুকিয়ে-শোনা কথাগুলো আবার চকিতে মনে প'ড়ে গেল—

"মনে করেছিলুম আপদ-বালাই বিদেয় হয়েছে, তা' নয়!"

"এতটুকু সংশ্রব রাখাও চলবে না আর।"

তাই হোক্! এমন ক'রে আপদ-বালাই হ'য়ে, জীবন্মৃত হ'য়ে থেকে, মিছে দুঃখ পাওয়া, দুঃখ দেওয়া আর কেন? এ জীবনের এই-খানেই শেষ হ'য়ে যাক্—কি দরকার!—বিষ! তা'ও তো রয়েছে, ঐ যে মালিশের শিশিটা…… তার গায়ে বড় বড় লাল অক্ষরে স্পষ্ট ক'রে লেখা 'পয়জন্'! ওতেই এ রোগ-জর্জ্জরিত ব্যথাহত জীবনের অবসান হবে না কি? তাই হোক্ তবে, এ পথ ছাড়া আমার নিষ্কৃতির আর কোনো উপায় নেই, মরণেই আমার মুক্তি! কিন্তু…

মুক্তির আগে যদি ওঁকে একবারটী তেমনি নিবিড়ভাবে পেতুম, এই শেষ বার, আর কোনো দিন······নাঃ।

শঙ্কর ঘরে এসে ফিরে যাচ্ছে দেখে ডাকলুম—শঙ্কর!

—কি মা?······

—বাবু অনেক রাত্তে ফিরবেন, না?

—বোধ হয়, নইলে খাবার করতে নিষেধ করলেন কেন?

আমার মুখের পানে ব্যগ্র-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে শঙ্কর বল্‌লে—বাবুকে ডেকে আনি না মা? তিনি তো জানেন না অসুখের কথা!

ছেলেটা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে না কি? আমি মাথা তুলে ব্যগ্রভাবে বল্‌লুম—কোথায় পাবে তাঁকে? তিনি কি এখনো মাসিমার বাড়ীতে······

—যেখানেই থাকুন, ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীও আমি জানি মা!

—থাক্, কি দরকার? এখন তো ভাল বোধ করছি একটু।

কথাটা বল্‌তে একটা মর্ম্ম-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে যেন বুকখানা দীর্ণ হ'য়ে গেল। হায়! আমি তাঁকে ডেকে পাঠাব? আর কিসের জোরে—কোন্ অধিকারে? কাজ নেই! এতদিন এত সহ্য করেছি যেমন ক'রে, তেম্‌নি এ ব্যথাও সইব। দাও! আমার এ ভাঙা বুকে তুমি যত ব্যথা দিতে পারো দাও···ও-গো নিষ্ঠুর! আর তো দিতে পারবে না! আর কতক্ষণ!—এই শেষ···

আবার সন্ধ্যা হ'ল। এই সন্ধ্যাই তবে শেষ, শেষ-সন্ধ্যা হোক্!

রাতের ফুল

পশ্চিম-দিগন্তে ছিন্নমেঘের ফাঁকে ফাঁকে অস্ত-রবির শেষ শিখাটী এখনো জ্বলছে, তার আভা বন্ধ-দরজার সার্শীতে ঠিক্‌রে প'ড়ে সমস্ত ঘরখানা আলোয় আলোময় করছিল। কি সুন্দর আলো! এ আলো কাল আর দেখতে পাব না…

দেখেও কাজ নেই আর!

সামনের টেবিলে ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডের মধ্যে আমাদের দু'জনের পাশাপাশি ক'রে তোলা ফোটোখানা এখনো তেম্‌নি ভাবে রাখা রয়েছে। এই ঘর, আমার ফুল-শয্যার সুখের বাসর, একদিন কত সাধ ক'রে সাজিয়েছিলুম নিজের হাতে — তখন জানতুম না, এ আর একজনের… ওঃ! আমার শেষ-নিঃশ্বাস এই ঘরেই পড়বে, আর কোথাও নয়!…

মা-গো! তোমার দুঃখিনী রজনীকে তোমার কোলে স্থান দাও, মা! এ জগতে তার স্থান হ'ল না আর……

ফাঁকি, ফাঁকি! সমস্ত জীবনটাই শুধু ফাঁকির উপর দিয়ে চ'লে গেল! আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে কোথায়, কোন্ আঁধারের দেশে, কে জানে? সে দেশও কি এমনি! সাঁঝের ঝাপ্‌সা-ছায়া ঘনিয়ে-আসা-বিষণ্ণতার মতো যেন বুক চেপে ধরছে। এখনো এলেন না! কত রাত্তে আসবেন কে জানে? সে ছেড়ে দিলে তবে তো?… কি ক'রে আসবেন!

তার আগেই তা' হ'লে……হ্যাঁ, কি হবে আর শুধু চোখের-দেখা দেখার আশায় থেকে!

বিশুর মা এসে আলোর সুইচ্‌টা খুলে দিতেই আমি চোখ বুজিয়ে ফেল্‌লুম।

রাতের ফুল

আমাকে ঘুমন্ত মনে ক'রে সে নিঃশব্দে চ'লে গেল। বাঁচ্‌লুম! এখন ঘরে আর কেউ নেই। আস্তে-আস্তে চোখ মেলে দেখি, সামনে হাতের কাছেই ছোট টেবিলটার উপর সেই শিশি······তার লাল অক্ষরে লেখাটা কি রকম জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে! উঃ!······

ও কার বুকের রক্তধারা গো?···আমার মতো কোন্‌ সর্ব্বহারা অভাগিনীর বুঝি?······

ও যে এ দিকে এগিয়ে আস্‌ছে! আমার চোখে মুখে—সর্ব্ব শরীরে একেবারে রক্তে রক্ত ক'রে দিলে যে! উঃ! মা গো! বুক জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! এ তো রক্ত নয় আগুন—এ আগুনে যে আমার সব পুড়ে গেল! উঃ-হু-হু! চোখেও যে দেখতে পাই নে আর··· অন্ধকার—সব অন্ধকার!···

আমার বুকের কাছে এ কে রে? খোকন? ও আমার সোনা রে······স'রে যা, স'রে যা ধন! এ আগুনে তুই যে ভস্ম হ'য়ে যাবি মাণিক!

অন্ধকারে ও কারা সব বকাবকি করছে? কি বলে? বিশুর মা, সর্ব্বনাশ, আন্‌ আন্‌ ডাক্তার! ও মা বালিশ আঁচড়ায় কেন? বউরাণী······

এ কিসের গণ্ডগোল? কিছুই বোঝা যায় না!

রোজি!···ও কে? কে ডাকলে গো? ডাকো ডাকো, আবার ডাকো! তোমার ওই মধুর ডাক দিয়ে মধুর স্পর্শ দিয়ে আমার

রাতের ফুল

এ বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দাও — ও-গো দরদী আমার! তোমার দেওয়ার শেষ হ'য়ে গেছে, আমার নেওয়ার শেষ যে এখনো হ'ল না প্রিয়তম!

এসো, ও-গো! কাছে এসো! আরো কাছে, আমি তোমাকে চাই, তোমাকে ... ওঃ!

মুক্তি চাই নে, স্বর্গ চাই নে, শুধু তোমাকে...আঃ! মা গো!...

পবিত্রর কথা

চ'লে গেলে, সত্যিই চ'লে গেলে!

ওঃ! একবার, শেষবার, ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলে না...

শুধু আমাকে জন্মের মতো চির-অপরাধী ক'রে গেলে!

আমি কি অন্ধ হয়েছিলুম? পাগল হয়েছিলুম? উঃ!

রোজি! রজনী! রজনীগন্ধা আমার!

না, সে নেই, সে নেই! নেই—সে চ'লে গেছে!

রজনীগন্ধা রাতের ফুল, রাতের আঁধারেই ঝ'রে গেছে!

— শেষ —